নেহরু বাল পুস্তকালয়

পক্ষী জগৎ

লেখা : জামাল আরা
ছবি : জে. পি. ইরানী
অনুবাদ : ইন্দ্রাণী সরকার



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-1060-7

প্রথম প্রকাশ : 1970 (শক 1892)
সপ্তম মুদ্রণ : 1995 (শক 1917)

প্রচ্ছদের ছবি : চড়ুই

মূল্য : 9.50 টাকা

Watching Birds *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

আত্মরক্ষাকারী বর্ণবৈচিত্র্য আর প্রাকৃতিক সাদৃশ্য

পাখি কে না ভালোবাসে ? এদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জানতেও বেশ মজা লাগে। এরা কত সুন্দর আর কতই না রঙচঙে। দেখলে মনে হয় যেন সব সময়ই ব্যস্ত। এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, দৌড়চ্ছে ; কখনও বা কিচির-মিচির করছে, গান গাইছে। আবার কখনও জলে সাঁতরে স্নান সেরে নিজেদের গায়ের পালক পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে মেলে ধরছে। নিজেদের পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে কতই না যত্ন নেয়। এদের এই সুন্দর হাবভাব আর আনন্দের কলকলানি আমরা সত্যিই খুব ভালবাসি। এরা না-থাকলে পৃথিবীটা বড়ই একঘেয়ে লাগত।

একটু ভাবো দেখি, কত রকমারী পালক আর কি সুন্দরভাবেই না তা সাজানো। এই রঙবেরঙের পালকের গুচ্ছ যা দিয়ে তারা নিজেদের ঢেকে রাখে, তা এমনই সুন্দর, হাল্কা আর নরম যে বলে বোঝানো যায় না। এই নানান রঙের সুন্দর নক্সাদার পালকগুচ্ছ পাখিদের অনেক কাজে লাগে। এদের পালকের এই চমৎকার রঙ জমি ও গাছপালার রঙের সঙ্গে হুবহু মিশে যায়, কি নক্সায়, কি রঙের আভায়। এই মিলই এদের গাছপালা ও জমিতে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। রঙের এই সামঞ্জস্যকেই বলা হয় 'আত্মরক্ষাকারী রঙ'। এক কথায় বলা যায়, এই রঙের মিলমিশটাই এদের শত্রুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে সাহায্য করে। পাখিরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে যতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, ততক্ষণ এরা আছে কি নেই, বোঝাই যায় না।

কাদা-খোঁচা কি বিলাতী চাহা জাতের পাখিরা আগাছা, ঘাস আর ঝরা পাতার মধ্যেই থাকে। এদের পালকে নানা রঙের ফুট্‌কি আর আঁকা-বাঁকা দাগের ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। এরা যেখানে থাকে সেই জায়গার সঙ্গে এই পালকের নানা বিচিত্র রঙের যথেষ্ট মিল আছে। তিতির আর বটের পাখিকেই সাধারণতঃ শিকার করা হয়—এদের

পালকের রঙ তামাটে, তার মধ্যে কালোর ছিট দেওয়া। এরা ধানের খেতে চড়ে বেড়ায়। এই কারণেই খুব কাছ থেকেও এদের নজরে পড়ে না।

ছোট পাখিদের মধ্যে চর্চরি আর ভরত পাখিকে পোড়ো, জলা জমিতে দেখা যায়। চিল বা ঈগলের মতো শিকারী পাখিদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু তাও এরা এড়িয়ে যায়। দূর থেকে ক্ষেতের মধ্যে এদের ঠিক মাটির ঢেলার মতো মনে হয়।

ঘন সবুজ পাতার মধ্যে যেসব পাখি বাস করে তাদের গায়ে টকটকে লাল, নীল, হলদে আর সবুজ মেশানো রঙ দেখতে পাওয়া যায়। প্রখর সূর্যের আলোয় শত্রুরা এদের যখন দেখে, এইসব ঝলসানো রঙে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তাই এদের ঠিকমতো দেখতে পায় না। একেই আমরা বলি 'আত্মরক্ষাকারী বর্ণবৈচিত্র্য'।

'অনুকরণ' ছদ্মবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। ছোট, দুর্বল পাখিরা বড়, শক্তিশালী পাখিদের অনুকরণ করে, দেখতে অনেকটা তাদের মতো হয়ে ওঠে। 'আত্মরক্ষাকারী অনুকরণের' ভালো উদাহরণ পাবে তোমরা বাজপাখির মতো দেখতে খুদে কুকুপাখির বেলায়



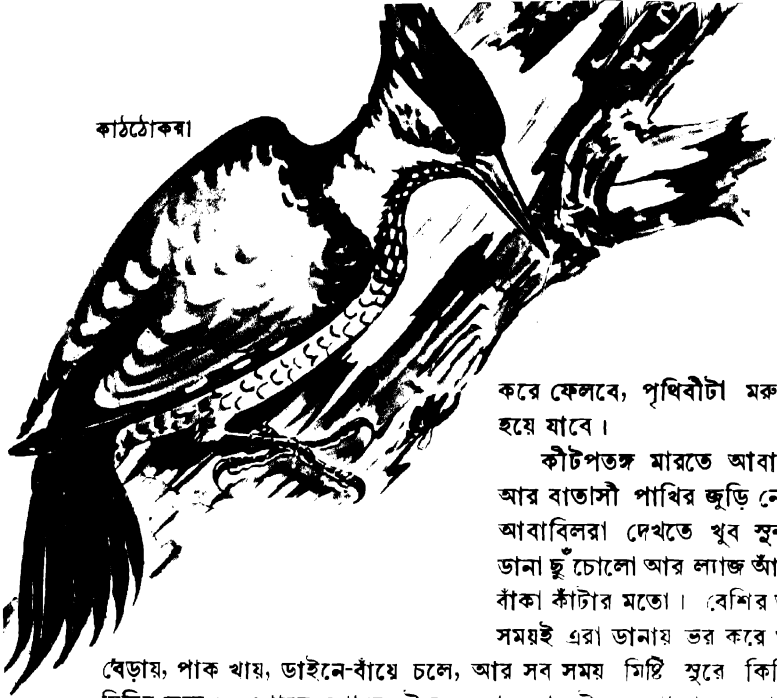
বসন্ত বৌরী



আবাবিল ও বাতাসী

পাখিরা কেমন ভাবে মানুষকে সাহায্য করে

পোকামাকড়দের সঙ্গে যুঝতে পাখিরা আমাদের অনেক সাহায্য করে। এদের সাহায্য ছাড়া পৃথিবীতে বাস করা খুবই মুস্কিল হয়ে পড়ত। খেত-খামারে, বনে-জঙ্গলে, ফল-ফুলের বাগানে অসংখ্য ছোট-বড় নানান জাতের পোকামাকড় আছে। তারা গাছ-গাছড়া সব কিছুই খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। শুধু ভারতবর্ষেই তিরিশ হাজারের বেশি নানান জাতের পোকামাকড় দেখতে পাওয়া যায়। এরা যে সব সময়ই ক্ষতি করে তা নয়। প্রকৃতির রাজ্যে এদেরও নিজের নিজের কিছু-না-কিছু করার থাকে। কাজেই অনেকেই আমাদের কোন-না-কোন কাজে আসে। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি এরা সংখ্যায় বাড়ে। তাই, কিছুতেই এদের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তা না হলে, এরা ঘাসপাতা সব খেয়ে উজাড়



কাঠঠোকরা

করে ফেলবে, পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে যাবে।

কীটপতঙ্গ মারতে আবাবিল আর বাতাসী পাখির জুড়ি নেই। আবাবিলরা দেখতে খুব সুন্দর, ডানা ছুঁচোলো আর ল্যাজ আঁকা-বাঁকা কাঁটার মতো। বেশির ভাগ সময়ই এরা ডানায় ভর করে ঘুরে বেড়ায়, পাক খায়, ডাইনে-বাঁয়ে চলে, আর সব সময় মিষ্টি সুরে কিচির-মিচির করে। এখানে-ওখানে উড়ে বেড়ায় আর উড়ন্ত পোকা ধরে খায়। উড়ন্ত অবস্থাতেই জলের উপর ভাসতে ভাসতে জল খায়। উড়তে এরা খুবই ওস্তাদ। ওড়েও খুব তাড়াতাড়ি। জমিতে বা গাছের ডালে বসার ব্যাপারে কিন্তু এরা একেবারেই আনাড়ি। অন্য পাখিদের মত লাফাতে বা দৌড়তে পারে না। পা খুবই ছোট, নখ দিয়ে শুধু সরু দাঁড় ধরতে পারে। যেমন, গাছের সরু ডাল, টেলিগ্রাফ কিংবা টেলিফোনের তার।

বাতাসী পাখিরা সহর বা গ্রামের ওপর দিয়ে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়ায়। আবাবিলদের মতো দেখতে হলেও এরা কিন্তু ভিন্ন জাতের। পরস্পরের কোনো সম্পর্ক নেই। বাতাসীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আবাবিলের নেই। এদের ডানা বেশ লম্বা, ছুঁচোলো আর বাঁকানো। পালক একই ধরণের ধূসর তামাটে রঙের। এদের বলা হয় 'উড়ন্ত পাখি', সব সময়ই উড়ছে। কখনসখন মাটিতে নামে, বাকি সময় উড়ে উড়ে মাছি মশা খেয়ে বেড়ায়।

কাঠঠোকরা আর এক ধরণের পোকাখেকো পাখি। গাছের গুঁড়ি বা বড় বড় ডাল থেকে পোকা খুঁটে খায়।

পাখিরা অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক পোকা খেয়ে ফেলে। দেখা গেছে, একটা ছোট পাখি আধ ঘন্টারও কম সময়ে ছ'শোর চেয়েও বেশি গুটিপোকা বা শুঁয়ো পোকা খেতে পারে। ঠিক ঐ একই সময়ের মধ্যে আর এক জাতের ছোট পাখি গাছ থেকে প্রায় তিন হাজার গেছো উকুন খুঁটে খেতে পারে। এক জোড়া চড়ুই পাখি এক ঘণ্টা না থেমে, এদিক-ওদিক উড়ে বেড়িয়ে, ঠোঁটে করে নিজেদের বাচ্চাদের জন্যে পোকামাকড় মিনিটে দুবার করে আনতে পারে।

চিল, ঈগল, বাজ ও অন্য শিকারী পাখিদের চাষীরা পছন্দ করে না। এরা মুরগীর বাচ্চা, এবং পোষা পাখি ধরে খেয়ে ফেলে। কিন্তু মেঠো ইঁদুর, নেংটি ও কাঠবিড়ালী, অর্থাৎ যারা ফসল নষ্ট করে তাদেরও এরা শিকার করে। সাপ বা অন্যান্য প্রাণী যারা পাখির ডিম ও বাচ্চা খেয়ে ফেলে, এইসব শিকারী পাখিরা তাদের মেরে ফেলে অন্য পাখিদের বাঁচাতে সাহায্য করে। যেসব মারাত্মক কীটপতঙ্গ নিজেদের মধ্যে বীজাণু পুষে রাখে আর তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জীবন বিপন্ন করে তোলে, তাদেরও শিকারী পাখিরা মেরে মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে।



ঈগল

শকুনি, চিল আর কাক খুব দক্ষ ময়লা-খেকো পাখি। মরা জন্তু আর ময়লা খেয়ে আমাদের পথ-ঘাট ও গ্রামাঞ্চল পরিষ্কার রাখে। দুর্ভিক্ষ আর বন্যার সময় এরা ঝাঁকে ঝাঁকে নিচে নেমে আসে। চারধারে ছড়ানো মরা জন্তুদের খেয়ে ফেলে। শকুনিরা এত তাড়াতাড়ি গিলতে পারে যে দেখলে তোমরা আশ্চর্য হবে।

রঙ বেরঙের ফল, ফুলে-ভরা গাছপালা পাখিদের হাতছানি দেয়। তাই বলে ভেবো না, গাছেরা পাখিদের ওপর খুব সদয়। আসলে নিজেদের বীজ ছড়াবার জন্যেই পাখিদের সাহায্য চায়। সমস্ত বীজই যদি গাছের তলায় পড়ে, তাহলে এত চারাগাছ জন্মাবে যে আলোবাতাসের অভাবে কেউই বাঁচতে পারবে না। চারাগাছগুলো না পাবে সূর্যের আলো, না বাতাস, না জল, না পাবে বাড়বার জন্যে প্রয়োজন মত জায়গা। ফলে, শুকিয়ে মরে যাবে। তাই বড় বড় গাছ তাদের বীজ যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিতে চায়। চারাগুলো যাতে ভালো ভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

পাখিরা এই কাজে সবচেয়ে যোগ্য। নানা রঙের রসালো ফলের মধ্যে বীজ লুকিয়ে থাকে। এই ফলের লোভ দেখিয়ে গাছেরা ক্ষুধার্ত পাখিদের কাছে নিয়ে



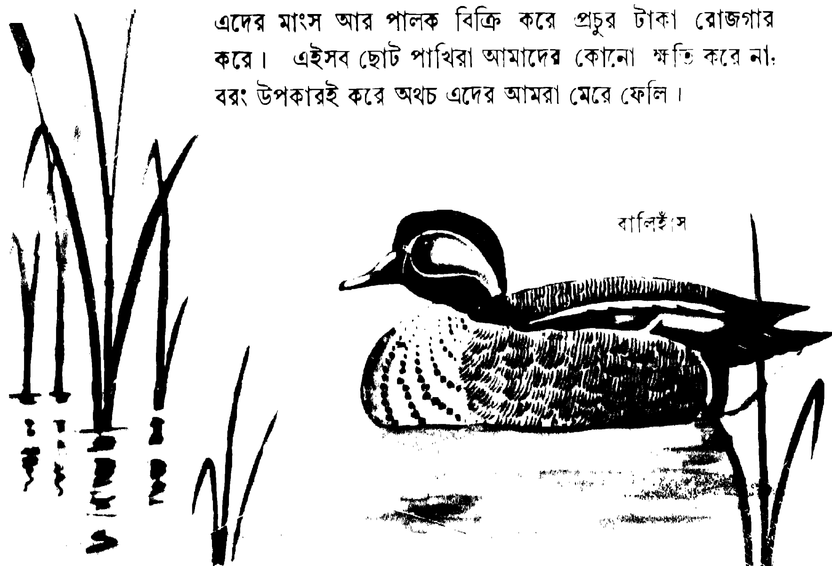
ফুল-ঠোকরা

আসে। রঙীন ফল খেতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা উড়ে এসে গাছে বসে। ফল ঠোকরাতে ঠোকরাতে তারা বীজ ছড়ায়। যেসব বীজ তারা গিলে ফেলে সেগুলো পরে তাদের বিষ্ঠার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, ফলে বীজ আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক ছোট ছোট বীজ কাদায় পাখিদের পায়ে অথবা পালকে আটকে যায়। এইভাবে দূরদেশে পাখির সঙ্গে চলে যায়। এইরকম করে পাখিরা নানান জায়গায় বীজ ছড়াতে সাহায্য করে।

ফুলের পরাগ-সংমিশ্রণে পাখিরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। কয়েক জাতের পাখির জিব আর ঠোঁট এমনভাবে তৈরি যে তারা ফুলের ভেতর থেকে মধু বার করে খায়। মধু খাবার সময় কিছুটা ফুলের রেণু এদের মাথায় কিংবা পালকে আটকে যায়। পাখিরা যখন অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন এই বয়ে-আনা রেণু ফল ফলাবার কাজে লাগে।

হাজার হাজার শিকার-করার পাখি (যেমন বাটের, তিতির) ও জলের পাখিকে (যেমন হাঁস, বালিহাঁস, কাদা-খোঁচা) জালে ধরে কিংবা গুলি করে মেরে বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠানো হয়। এদের মাংস খেতে খুব ভালো। প্রত্যেক বছর ব্যাপারীরা এদের মাংস আর পালক বিক্রি করে প্রচুর টাকা রোজগার করে। এইসব ছোট পাখিরা আমাদের কোনো ক্ষতি করে না, বরং উপকারই করে অথচ এদের আমরা মেরে ফেলি।


বালিহাঁস



টুনটুনি

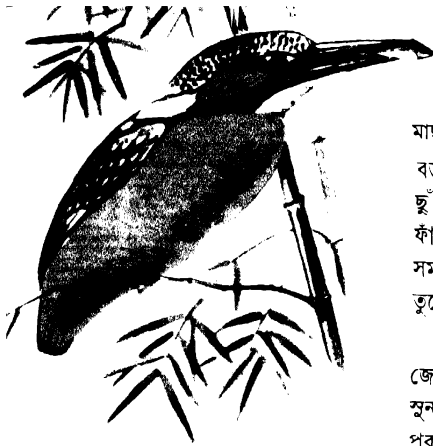
কারিগর পাখি

পাখিদের জীবনযাত্রা যদি খুব খুঁটিয়ে দেখ, তাহলে অনেক মজার জিনিস দেখতে পাবে। পাখিদের তোমরা সব সময় গাছে গাছে উড়ে বেড়াতে দেখ। কিন্তু এরাও কম ব্যস্ত নয়। আমাদের মতোই এরা ঘর-সংসার পাতে, বাচ্চাদের মানুষ করে। কথা বলবার ভাষাও আছে।

পাখিদের রাজ্যে কারিগর আছে। দরজি, কাঠুরে, জেলে ও আরও অনেক জাতের।

দরজি ঃ টুনটুনি বা দরজি পাখি খুব সরু গাছের আঁশ, মাকড়সার জাল আর গুটিপোকার রেশমকে সুতোর মত ব্যবহার করে। দুতিনটে পাতা নিয়ে নিজের সরু ধারালো ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে সুন্দর বাসা তৈরি করে।

কাঠুরিয়া : কাঠঠোকরা পাখি গাছের গুঁড়িতে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে পোকা খুঁজে বেড়ায়, ঠিক কাঠুরিয়াদের মত 'ঠক্‌-ঠক্‌' শব্দ করে। ঠোঁট এদের করাতের মতো ধারালো। ঠোঁটটা গাছের ছাল ছাড়ানোর সময় কুড়ুলের মত ব্যবহার করে আর গাছের গুঁড়িতে ছেঁদা করার সময় ছেনীর মত। এদের জিব



বড় অদ্ভুত। লম্বা অথচ গোল আর ছুঁচলো। জিব সব সময়ই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বাইরে আসে যায়, এই সময়ই গাছের পোকা আর ডিম মুখে তুলে নেয়।

জেলে : মাছরাঙা পাখিই জেলে-পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। এদের দেখা যায় পানা-পুকুরের কাছে, ডোবার ধারে অথবা ছোট ছোট নদীর পারে। নদীর ওপর নোয়ানো ডালের ওপর বসে একমনে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। রূপালি মাছ যখন জলের তলা দিয়ে সাঁতরে যায়, সেই সময় মাছরাঙারা হঠাৎ দাঁড় থেকে ঝুপ করে জলে ডুব দিয়ে মাছটিকে চিৎ করে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে উঠে আসে।

ঝাড়ুদার : ঝাড়ুদার পাখিদের মধ্যে শকুনের নামই মনে পড়ে সবার আগে। শকুনদের দেখতে কিন্তু কদাকার। ঢাউস মোটা, ন্যাড়া মাথা, রোঁয়া ওঠা হাড়গিলে গলা, এদের মোটেই দেখতে ভালো নয়। ডানা মেলে কায়দা করে ওড়ার ব্যাপারে এদের জুড়ি নেই। ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ উঁচু আকাশের দিকে উড়ে চলে ; নজর রাখে নিচের জমির দিকে। এদের সঙ্গী চিল। এদের সঙ্গে গ্রামে, পথে-ঘাটে ও শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যত মরা জন্তুজানোয়ার আর জঞ্জাল দেখতে পায় সেগুলো খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলে।


শকুন


কাক

চোর : পাখিদের মধ্যে কাক সব নামকরা চোর। কুচকুচে কালো পালক, আর কালো তীক্ষ্ণ চোখের জন্যে এদের বেশ ভালোই লাগে। তবু কেউই এদের ভালো-বাসেনা। মানুষ, জন্তু—কাউকেই এরা বাদ দেয় না। ক্ষেতে কিংবা দোকানে, যেখানেই ধান থাকুক, এরা চুরি করতে ভয় পায় না। অন্য পাখির বাসা থেকে ডিম বা ছানাপোনা, সবই চুরি করে নেয়।

পাহারাদার : ফিঙে সবচেয়ে ভালো পাহারাদার। এদের পালকগুচ্ছ দেখতে ঠিক কালো পোষাকের মত। মাঠে-ঘাটের দিকে এরা নজর রাখে। নিজের চেয়ে আকারে বড় পাখিদের আক্রমণ করতেও পেছপা হয় না। ছোট ভীরু স্বভাবের পাখিরা এদের বাসার আশেপাশে বাসা বাঁধে। শুধু নিজের নয়, আশেপাশে প্রতি-বেশীদের বাসাও পাহারা দেয়। কাক, যারা ডিম চুরি করে, তাদেরই এরা বেশি জব্দ করে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এরা জাগে। সুন্দর মিষ্টি শিস্ দিয়ে যেন সকাল-বেলাকে সাদর আহ্বান জানায়।


ফিঙে

রাতের পাহারাদার : সারাদিন ঘুমিয়ে রাতের অন্ধকারে প্যাঁচারা জেগে থাকে। সারারাত সহরাঞ্চলে পাহারা দেয়। ক্ষেত খামারে, ধানের গোলায়


পঁ্যাচা

নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায় ইঁদুর, ছুঁচোর খোঁজে। বাঁকা ঠোঁট আর ধারালো নখ দিয়ে শিকার করে।

শিকারী ঃ দিনের আলোয় শিকার করতে ওস্তাদ ঈগল আর বাজ পাখিরা। ছুঁচোলো বাঁকা ঠোঁট, আর ধারালো নখ দিয়ে এরা নেংটি ইঁদুর আর কাঠবেড়ালী ধরে। ইঁদুর ও কাঠবেড়ালী ক্ষেতের অনেক ক্ষতি করে। অনিষ্টকারী পোকামাকড়ও এরা ধরে খায়। বেশ জোরে এরা উড়তে পারে। ছুঁচোলো বাঁকা ঠোঁট আর ধারালো নখই শিকারের একমাত্র অস্ত্র।

আলসে পাখি ঃ কোকিলের অনর্গল 'কুহু' 'কুহু' ডাক নিশ্চয়ই শুনেছ। কোকিল এত অলস যে নিজের বাসাও বাঁধে না। এরা বড় চালাক, কাকেদের বাসায় নিজেদের ডিম পেড়ে আসে। কাকেরা ওদের ডিম 'তা' দিয়ে ফোটায়, ছানাদের বড় করে। অবশ্যি বড় হয়ে এরা আবার কোকিলের দলেই ভিড়ে যায়।

গাইয়ে ঃ গাইয়েদের মধ্যে নামকরা হচ্ছে দোয়েল। শীতকালে এরা আস্তে শিস্ দেয় আর বসন্তে মিষ্টি সুরে গান করে। পিঠের ওপর সাদাকালো ল্যাজ


বাজ



বাবুই পাখী

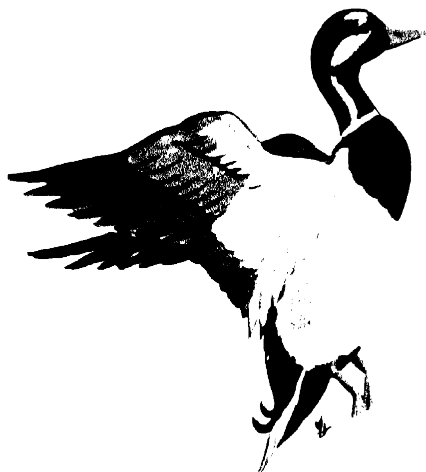
দুলিয়ে যখন গান করে, তখন সব পাখিদের মধ্যে এদেরই বেশি চোখে পড়ে।

নাচিয়ে ঃ নাচন পাখির নাচ সত্যিই দেখতে সুন্দর। ডালে ডালে লাফালাফি করতে করতে হঠাৎ থেমে, পায়ে ভর দিয়ে, এধার-ওধার ঘুরে-ফিরে নাচতে সুরু করে। নাচের সময় সারাক্ষণ পিঠের ওপর ল্যাজটি দুলিয়ে দুলিয়ে পাখার মত মেলে আর বন্ধ করে।

তাঁতি ঃ তাঁতিজাতের পাখি বাবুই এদের বাসা, দরজি পাখিদের মতই নিখুঁত। ঘাসের কিংবা খেজুর গাছের পাতা দিয়ে শক্ত করে বোনা এদের বাসা দেখতে ঠিক মনে হয় যেন একটা ইলেকট্রিক বাল্‌বকে উল্টো করে দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয়েছে। বাসার ভেতরটা কিন্তু দুভাগে ভাগ করা। মুখের চোঙার দিকটা অগোছালোভাবে নানারকম খড়কুটো দিয়ে ভরা, শত্রুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। ভেতরে থাকে ডিম পাড়ার জায়গা। এরা নিজেদের বাসা লুকিয়ে রাখে না, কেননা, দলবেঁধে এরা বাসা বাঁধে। রকমারি আকারের বাসা, সাধারণতঃ জলের ওপর কোনো খেজুর পাতার আগায় বা অন্য গাছের ডালে ঝুলতে থাকে।



নাচন



হাঁস

কসাই ঃ এই নামটা দেওয়া হয়েছে এক জাতের পাখিকে যারা নিজেদের শিকার গাছের কাঁটায় বিঁধিয়ে রাখে। দরকারের চেয়ে বেশি খাবার এরা শিকার করে। ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্যে এইভাবে জমিয়ে রাখে। পোকামাকড় এদের খাদ্য। শক্ত বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে নেংটি ইঁদুর আর গিরগিটিও শিকার করে।

যাযাবর ঃ যে সব পাখি দেশ-দেশান্তরে উড়ে বেড়ায় তাদের মধ্যে জংলী হাঁসের নাম করা যেতে পারে। নানান রকমের হাঁস শীতকালে য়ুরোপ, উত্তর এশিয়া ও তিব্বত থেকে ভারতবর্ষে উড়ে আসে।

কসাই পাখি



ধনেশ

বসবাস

ভিন্ন ভিন্ন জাতের পাখি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকে। অভিজ্ঞ পাখি জঙ্গলে, মাঠে, জলাশয়ে, খানা-ডোবার ধারে অথবা ক্ষেত-খামারে কোথায় কি ধরণের পাখি পাওয়া যাবে, এক নজরে তাকিয়েই তা বলতে পারেন। কিছু কিছু পাখি সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায় আর কিছু পাখি বিশেষ বিশেষ জায়গাতেই থাকতে ভালবাসে। এছাড়া একজাতের পাখি আছে যারা শীতকালে এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে



যায় খাবার আর গরম আবহাওয়ার আশায়—বসন্তে আবার নিজের দেশে ফিরে আসে।

অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশের ওপর পাখির আকার নির্ভর করে। একই পাখি হিমালয়ে যত বড় পাওয়া যায়, কন্যা-কুমারিকায় ঠিক তত ছোট আকারে পাওয়া যায়। এই একই কারণে হিমালয়ের অথবা অন্য পাহাড়ের মাথায় যে পাখি বেশ বড় আকারের হয়, সেই আবার পাহাড়ের তলার দিকে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। পাখির রঙও জলহাওয়ার ওপর নির্ভর করে।

আবহাওয়ার পরই পাখিদের জীবনে সবচেয়ে দরকারী হচ্ছে গাছগাছড়া। এই গাছগাছড়া আবার নির্ভর করে অক্ষাংশ, তাপমাত্রা, বৃষ্টি আর জায়গার অবস্থানের ওপর। জঙ্গলের গাছগাছড়া ক্ষেত, ফল ও ফুলের বাগানের গাছ-গাছড়া থেকে আলাদা। এই কারণে এইসব জায়গায় যেসব পাখি পাওয়া যায় তারাও ভিন্ন ধরণের। বনে-জঙ্গলে যে সব পাখি দেখা যায় তারা খুব রঙচঙে হয়। যেমন সাদা-কালো ধনেশ পাখি। হলদে মোমের শিঙের আকার হয় এদের ঠোঁটের। সোনালী রঙের বেনে বৌ, সাদা-কালো অথবা লাল রঙের বুলবুলি আর দুধরাজ—এদের পালক রূপোলী সাদা, ল্যাজ ঝোলানো, সব সময়ই দুলতে থাকে। ছোট ছোট মৌটুসী পাখির

রঙ বেগুনী, সবুজ, গাঢ় লাল অথবা হলদে হয়। ঘাসের মত সবুজ হরিয়া, ময়ূর ও নানান উজ্জ্বল রঙের পাখিও দেখতে পাওয়া যায়।

ফল-ফুলের বাগানে আর গ্রামে যেসব পাখি দেখা যায় তারা আমাদের খুবই চেনা। চড়ুই পাখি আমাদের আশেপাশে সব সময়ই থাকে। কেন, জান? আমাদের কাছ থেকে এরা অনেক খাবার জিনিস পায়। নস্যির মতো কটা রঙের শালিক পাখি, কখনও একটু ঝুঁকে আবার কখনও-বা সোজা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। খুব চটপটে সাদা-কালো রঙের গো-শালিক, চিতা, দোয়েল আর সাদা-কালো রাম-গাঙরাদেরও গাছের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

জমিতে থাকতে ভালোবাসে যেসব পাখি তাদের আমরা বলি 'জমির পাখি'। যেমন, দোয়েল, ভরত, বাদামী হলদে রঙের চর্চরি পাখি। গাছপালা কম এমন সব চাষ-আবাদের জমিতে এরা থাকতে ভালোবাসে।

নদীনালার ধারে, পুকুরের পারে, জলা আর জংলা জমিতে থাকতে ভালোবাসে কিছু পাখি, এদের বলতে পার 'জলাপাখি' বা জলের পাখি।



ময়না



পাখির ডাক

পাখিদের কথা বলার ভাষা আছে। এরা তা ব্যবহার করে এদের নানান প্রয়োজনে। আমাদের মতো গোলমেলে নয় এদের ভাষা। সহজেই একে অন্যের কাছে মনের কথা বলতে পারে। এক এক পাখির এক এক ডাক। এই ডাক দিয়েই এদের চেনা যায়। বিপদের সময় ভয় পেয়ে এরা ডাক দিয়ে দূরে যাবার ইঙ্গিত জানায়। ভালোবাসার ডাকও আছে। ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারির সময় এরা ডাক দেয় আর সব পাখিদের জড়ো হবার জন্যে।

কিছু পাখি আছে, যারা চুপচাপই থাকে। আর কিছু বেশ সোর-গোল করে। এরা অনেক রকমের ডাকও জানে। পাখিদের মধ্যে পাহাড়ী ময়না আর টিয়া খুব ভালো কথা বলতে পারে। কিছু পাখি ওস্তাদ গাইয়েও। পাখিদের ডাক নানান রকমের। কান-ফাটানো কিচির-মিচির, বকবকানি, গলাছেড়ে ডাক, ভূতুড়ে চিৎকার, গোঙানি। নানা সুরের মিষ্টি শিস্‌ও দেয়। শামুকভাঙ্গা সারস পাখি নিজেদের ঠোঁট দিয়ে 'খট্‌-খট্‌' শব্দ করে, কাঠঠোকরা গাছের গুঁড়িতে ঠোঁট দিয়ে 'ক্লিক-ক্লিক' আওয়াজ করে।

পাখিদের ছানাপোনাদের ভাষা কিন্তু আলাদা। বড় হয়ে গেলে



কাদা-খোঁচা

এরা আর এই ভাষায় কথা বলে না। ছোটবেলায় এই ভাষাতেই এরা যা কিছু দরকার তা জানায়। ভয়-পাওয়া কিংবা নিজেদের গতিবিধির কথা এই ভাষাতেই মা-বাবাকে জানায়। বলতো দেখি, এইসব ছানাপোনারা কি করে এই 'শিস্' বা 'ডাক' দেওয়া শেখে? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোনো কোনো পাখি এটা জন্ম থেকেই পায়। আর কিছু মা-বাপের দেখে শেখে।

তোমরা হয়তো ভাব যে পাখিরা ঠোঁট দিয়ে গান করে। আগেকার দিনে পাখি বিশারদরা কিছু পাখির জিব চিরে দিতেন, যাতে এরা আরও ভালো গাইতে পারে। আসলে কিন্তু আওয়াজটা বেরোয় শ্বাসনালীর ভেতর থেকে, যেখানে শ্বাসনালী দুভাগে ভাগ হয়ে ফুসফুসে চলেছে। একটা পাতলা ঝিল্লী ঠিক এই জায়গাটার মুখে থাকে। এরই সাহায্যে আওয়াজ বেরোয়।

সাদামাঠা ছোট পাখিরাই সবচেয়ে ভালো গাইয়ে। বেশি রঙচঙে পাখিরা নিজেদের পালকের বাহার দেখিয়ে আমাদের মন কিনে নেয়। সাদাসিধে ছোট পাখিরা নিজেদের রূপ-জৌলুসের অভাব মিষ্টি সুর দিয়ে ভরিয়ে দেয়।

পাখি দেখা যাঁদের নেশা আর পেশা, তাঁরা কিন্তু পাখির রূপের চেয়ে পাখির স্বরের ওপর নির্ভর করেই এদের বনে জঙ্গলে খুঁজে বার করেন। খুঁজে-ফেরার সময় কিছুক্ষণ পর পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে এঁরা মন দিয়ে লুকিয়ে-থাকা পাখিদের ডাক শোনেন। গরমের সুরুতে আর বসন্তের গোড়ায় পাখিদের ডাক সবচেয়ে মিষ্টি আর জোরালো শোনায়। পাখিদের এই মিলিত গান শোনার সবচেয়ে ভালো সময় হল ভোরবেলা আর সন্ধ্যেবেলা।

ভালোবাসা আর তার প্রকাশ

ডিম পাড়ার সময় পাখিরা জায়গা বেছে নিয়ে নিজের মনোমতো সঙ্গী খুঁজে নেয়। সঙ্গী খোঁজার ব্যাপারে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও লক্ষ করা যায়। এরপর সুরু হয় বাসা আর ঘর বাঁধার পালা।

বসন্তকাল সব কিছুতেই প্রাণের সাড়া এনে দেয়। পুরুষ-পাখিরা এসময় মেয়ে-পাখিদের সঙ্গী হবার জন্যে নানাভাবে খোসামোদ করে। পুরুষ-পাখিদের পালকে এই সময় বেশ জমকালো রঙের বাহার। পালকের গড়নেও নানান শোভা দেখা দেয়। সারা দেহেই নতুনের আমেজ। মাথার ঝুঁটিতে, গলায়, কণ্ঠীতে, ঘাড়ের পালকে আর ল্যাজে কি চমৎকার রঙের বৈচিত্র্য। গায়ের চামড়ায়, ঠোঁটে, আর পায়ের পাতায়ও রঙ-বেরঙের আকর্ষণী ছোপ ধরে।

মেয়ে-পাখিরা কিন্তু এই সময় খুব সাদামাঠা দেখতে হয়। কেননা, এই সময় সারাক্ষণ এদের বাসা আগলে থাকতে হয়। এতে বিপদও থাকে অনেক রকম। এই সাদামাঠা গায়ের রঙ শত্রুদের হাত থেকে এদের বাঁচতে সাহায্য করে। কিন্তু কাদা-খোঁচা আর বাটের জাতের পাখির বেলায় ঠিক উল্টো। এদের মেয়ে-পাখিরাই এই সময় দেখতে খুব জমকালো হয়ে ওঠে। কেননা, ডিম পাড়ার পর পুরুষ-পাখিরাই ডিমে 'তা' দিয়ে ছানাদের বড় করে।

আমাদের 'জাতীয় পক্ষী' ময়ূরকে কি কখনও তার ময়ূরীর সঙ্গে দেখেছ? বেশ সুন্দর দেখতে লাগে এই জুটীকে। ময়ূর আস্তে আস্তে হেলেদুলে এগিয়ে যায় ময়ূরীর দিকে। নিজের জমকালো রঙীন পালক-গুচ্ছ ঠিক পাখার মত বিছিয়ে ধরে। কি সুন্দরই না দেখায়! রেশমের মতো ল্যাজের পালকের ধারে ধারে সোনালী আভা ছড়িয়ে থাকে।

প্রত্যেক পালকের আগায় ধূপছায়া রঙের একটা করে ছোপ ঠিক যেন চোখের তারার মত জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ময়ূরীর দিকে পেছন ফিরে আনন্দ-বিহ্বল ময়ূর পেখম তুলে নাচ সুরু করে দেয়। পেখমটা দেখতে মনে হয় ঠিক কালো রঙের প্রকাণ্ড একটা ঢাল। হঠাৎ সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের রঙবেরঙের পালকের ছটায় ময়ূরীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নাচার সময় পাখার মতো তার জমকালো ল্যাজটি কাঁপতে থাকে। ল্যাজের আগার প্রত্যেকটি চোখ যেন আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলায়, সবুজ থেকে নীল, তামাটে থেকে সোনালী। আবার সবুজে ফিরে আসে।

ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গী নানান ধরণের। কোনও কোনও পাখি হাওয়ায় নানান ভঙ্গীতে ডিগবাজি খায়। রঙীন পা-ওয়ালা পাখিরা তাদের



বটের



কাদা-খোঁচা

সঙ্গিনীদের চোখে পড়ার জন্যে আকাশে উড়ে গিয়ে পা ঝোলাতে ঝোলাতে আবার নিচে নেমে আসে। কিছু পাখি আবার নিজেদের রঙীন পালক ফুলিয়ে সঙ্গিনীদের চারপাশে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

পাখিরা ঠিক যেখানে-সেখানে বাসা বাঁধে না। অনেক ভেবেচিন্তে ওরা জায়গা বেছে নেয়। সহজেই খাবার পাওয়া যায় এমন জায়গায় বাসা বাঁধে, বাচ্চাদের খাওয়াবার কোনো অসুবিধে যাতে না হয়।

এই 'আস্তানা' বাছাই নিয়েও পাখিদের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ মারামারি হয়। ঝগড়াঝাটি মিটে গেলে প্রত্যেকটি পুরুষ-পাখি এক একটা জায়গার মালিক হয়, সব অশান্তির শেষ হয়। এরপর নিজের নিজের সঙ্গিনীর সঙ্গে ঘর বেঁধে বাচ্চাদের বড় করার পালা আরম্ভ হয়।

বাসা-বাঁধা ও বাচ্চাদের বড় করা

বেঁচে থাকার তাগিদে পাখিদের মধ্যেও ঝগড়া-বিবাদ সব সময় লেগে আছে। বাচ্চার লালনপালনের সময়টাই বাচ্চার আর তাদের মা-বাবার সবচেয়ে বিপদের সময়। গিরগিটি, সাপ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী আর বাঁদর পাখিদের ডিম চুরি করে। আমরাও বাদ যাই না। অন্য পাখিদেরও এ ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। কাক আর গাংচিল নামকরা চোর।

পাখির বাসা বাঁধার নিপুণতা নির্ভর করে তাদের প্রয়োজনের ওপর. পাখির বাসা সাধারণতঃ ছয় রকমের হয়।

ছাদ খোলা বাসা ঃ এগুলো খুব গভীর বাটির মতো দেখতে। যাতে ডিম কিংবা বাচ্চারা পড়ে না যায়। সুতো, চুল, নরম কাঠ, পালক, এই ধরণের নরম জিনিস দিয়ে এরা বাসার ভেতরটা তৈরি করে। কাক, সারস আর ঘুঘু পাখিই এই ধরণের বাসা তৈরি করে। কেননা, এরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাসা বেঁধে থাকে বলেই নিজেদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

ঢাকা বাসা ঃ গম্বুজের মত দেখতে। ওপরটা পুরো ঢাকা। একধারে একটু খোলা থাকে, আসা-যাওয়ার জন্যে। ঘরের ভেতরটা ছোট ছোট পালক আর চুল দিয়ে তৈরি।

সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসা ঃ মাছরাঙা ছোট বাঁশপাতা, আর আবাবিল পাখি নদীর ধারে ঠোঁট দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে, গর্ত খুঁড়ে বাসা বাঁধে।

গর্ত আর ফোকরের মধ্যে বাসা ঃ গাছের ফোকরে, পাহাড়ে কিংবা দেয়ালের গায়ে বাসা বাঁধে কাঠঠোকরা, প্যাঁচা, টিয়া, শালিক আর ধনেশ পাখি। হয় এরা গর্ত খোঁড়ে, নয় তৈরি-গর্তে বাসা


আবাবিল


শালিক

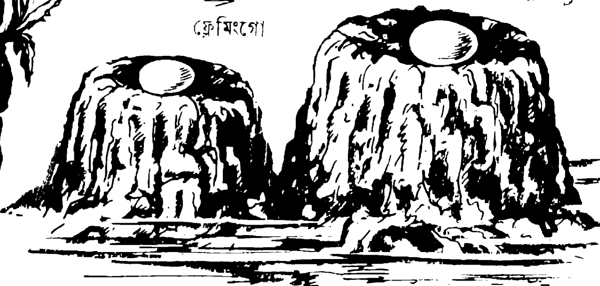

বুলবুল


ধণেশ


বাবলার


বনপা


বাঁশপাতা


ফ্লেমিংগো

বাঁধে। ধনেশ পাখিদের এক অদ্ভুত নিয়ম আছে। মেয়ে ধনেশ পাখি যখন গাছের ফোকরে ডিমে 'তা' দিতে বসে, পুরুষ-পাখি তখন তার চারিধারে একটা দেয়াল তুলে দেয়। এই 'তা' দেবার পুরো সময়টা পুরুষ-পাখি খাবার জোগাড় করে এনে একটা ছ্যাঁদা দিয়ে মেয়ে-পাখিকে খাওয়ায়।

যে বাসা পাখিরা বেরুবার সময় ঢাকা দিয়ে যায় ঃ পানকৌড়ি, ডাহুক আর পাতিহাঁসের বাসার ছাদ খোলা। মা-বাবা যখন বাইরে যায় তখন বাসার মুখ খুব সাবধানে ঢেকে দিয়ে যায়। পানকৌড়ির বাসা সরু গাছের ডাঁটা, শ্যাওলা আর পচা আগাছা দিয়ে জলের উপর তৈরি, দেখতে ঠিক ভেলার মত। বাসা দেখে ঠিক বাসা বলে মনে হবে না, যেন পচা গাছগাছড়া ভাসছে।

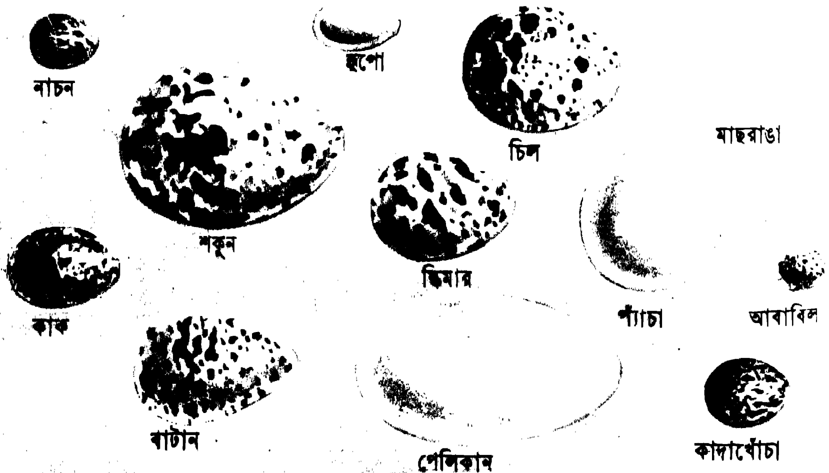
যে বাসা বাসাই নয় ঃ কুরি গাংচিল, বাটান, টিট্রিভ বা টিটি, আর কারবানক পাখি আসলে কোনো বাসাই তৈরি করে না। এদের ডিম দেখতে ঠিক এদের আশেপাশের জিনিসের মত। তাই চিনতে পারা খুব শক্ত। বাটান পাখি ছোট ছোট শামুক ও নুড়ি নিয়ে ফেলে নদীর শক্ত কিনারায়। তার ওপর ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ মা-পাখিরাই ডিমে 'তা' দেয়। পুরুষ-পাখি সব সময়ই তৈরি থাকে মা-পাখিদের সবরকম সাহায্য করার জন্যে। মা-পাখিরা যখন বাসার বাইরে খেতে আসে আর হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করে তখন পুরুষ-পাখিরাই ডিমে 'তা' দেয়।

বেশির ভাগ পাখিই বছরে একবার করে ডিম পাড়ে। কিন্তু প্রথম বারের ডিম যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় বারও ডিম পাড়তে পারে।

সব ডিম কিন্তু 'ডিম্বাকৃতি' হয় না। যে সব পাখিরা গাছের ফোকরে, পাথরের ফাটলে আর ভাঙ্গাচোরা বাড়ি অথবা ওই ধরণের জায়গায় ডিম পাড়ে, তাদের ডিম গোল হয়। সাধারণতঃ এইসব জায়গা থেকে

ডিম গড়িয়ে পড়ে যায় না। টিট্টিভ বা ঐ জাতের অন্য পাখিদের ডিম নাসপাতির মত দেখতে হয়। ডিমের সরু দিকগুলোকে ভেতরে দিয়ে ডিমগুলোকে এরা গোল করে সাজায়, যাতে কম জায়গা লাগে। অনেক পাখি চ্যাপ্টা পাথরের চাঁই বা সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের চূড়ায় মাত্র একটা বড় ডিম পাড়ে।

পাখিদের ডিমের সংখ্যা নির্ভর করে অনেকগুলো জিনিসের ওপর যথা : কত খাবার জোগাড় করতে পায়া যায়, নিজের নিজের অভ্যেস আর শত্রুর হাত থেকে ডিম বাঁচানোর ক্ষমতা। কেউ একটা ডিম পাড়ে, কেউ দুটো, কেউ বা আবার চারটেও পাড়ে। ঈগল সাধারণতঃ একটা থেকে চারটে, পাতিহাঁস একসঙ্গে পাঁচটা থেকে ষোলোটা আর রায়গাঙ্গরা চারটে থেকে ছটা। বেশির ভাগ 'জমির পাখিরা' ভালো উড়তে পারে না। তাই বেশি বিপদেও পড়ে। এরা একসঙ্গে কুড়িটাও ডিম পাড়ে। সময় সময় অনেক পাখি একই বাসায় ডিম পাড়ে।



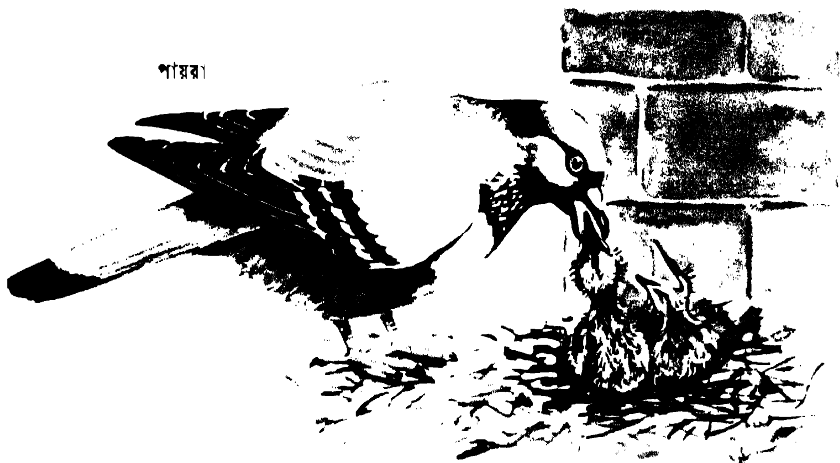
ডিমের খোলার রঙ আর গায়ের দাগ ডিমগুলোকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, টিয়া, প্যাঁচার বাসার ছাদ আছে। এরা তাই সাদা ধপধপে ডিম পাড়ে। এদের 'আত্মরক্ষাকারী বর্ণবৈচিত্র্যের, প্রয়োজন হয় না। এই সাদা ধপধপে রঙের দরুণ রাতের অন্ধকারেও ডিমগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেসব পাখির বাসার ছাদ খোলা, তাদের ডিমের রঙ হয়, আশেপাশের জিনিসের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। ফলে, শত্রুরা ডিমগুলো সহজে দেখতে পায় না। এইসব ডিমের রঙ সাধারণতঃ হলদে, সবুজ, নীল, তামাটে, বেগুনে কিংবা গাঢ় হলদেও হয়। বেশির ভাগ ডিমের খোলার ওপরটা মোলায়েম, চকচকে হয়। অনেকগুলো আবার সুন্দর পালিশ করা মনে হয়। কিছু ডিমের খোলা বেশ একটু খসখসে, খড়ির মত।

মা-বাপেরা ডিমে 'তা' দেয় ডিমগুলোকে গরম রাখার জন্যে। ডিমগুলো সব সময় যাতে সমান তাপ পায়, তার জন্যে মা-পাখিরা নিজেদের তলপেটের কিছু পালক ঝরিয়ে দেয়। দুচারটে পালক-ঝরানোর দাগ এদের তলপেটে পাওয়া যায়। একে বলা হয় 'তা-দেওয়ার চিহ্ন'। এই জায়গাটা ডিমের গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে পাখিরা আরামে বসে থাকে। পাখিরা যখন খাবার খুঁজতে বেরোয়, তখন ডিমগুলো একটু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এতে ডিমের কোনো ক্ষতি হয় না। ডিম ফোটাতে ছোট পাখিদের মাত্র এগারো দিন আর বড় পাখিদের আশী দিন পর্যন্ত লাগে। কিন্তু নরম ঠোঁটওয়ালা পোকামাকড়-খেকো পাখি, কি শক্ত ঠোঁটের বীজ-খাওয়া পাখি—সবাইকেই বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খাবারের সন্ধানে ফিরতে হয়। কিছু পাখি আধা-হজম-হওয়া খাবার বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চা পায়রারা নিজেদের ঠোঁট, মায়ের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দুধ খায়। এই দুধ আসলে আধা-হজম-হওয়া খাবার আর মায়ের মুখের রস। একজাতের সমুদ্রের পাখি আছে যারা মাছ খেয়ে একরকম তেলের মতো রস বার করে বাচ্চাদের

খাওয়ায়। খাওয়াবার রকমসকম যাই হোক না কেন, বাচ্চাদের খাওয়ানোটা বেশ ঝঞ্ঝাটের কাজ। বাচ্চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত এই ঝঞ্ঝাট পোহাতেই হয়।

চড়ুই, ভরত আর কস্তুরা পাখির বাচ্চাদের চোখ বন্ধ থাকে জন্মাবার সময়। তাই এরা আরো অসহায়। সাত দিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে বাসা ছেড়ে এরা বাইরে বেরোয়। হাঁস, মুরগী আর টিটি পাখির ছানাদের ডিম-ফোটার সময়ই চোখ ফুটে যায়। হাঁস, মুরগী, টিটি বা শিকার করা হয় এমন সব পাখির ছানাদের চোখ ফোটে ডিম-ফোটার সময়। তুলোর মতো নরম পালকে এদের গা ঢাকা থাকে। ডিম-ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এসে এরা নিজেদের খাবার খুঁটে খায়। এধার-ওধার ছুটোছুটি করে, সাঁতরেও বেড়ায়।

পাখিরা নিজেদের ছানাপোনা বাঁচাবার জন্যে শত্রুদের বীরের মতো আক্রমণ করে। একবার ছোট একটা বুলবুল পাখিকে দেখেছি কি ভাবে ঠুকরে ঠুকরে একটা চিলকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বিপদের সম্ভাবনা



পায়রা

বাটান



দেখলে পাখিরা সতর্ক হবার ডাক ডাকে। ডাক শুনে ছানাপোনারা ছুটে এসে মায়েদের ডানার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

বাটান বা ঐ জাতের পাখি যাদের শিকার করা হয়, তাদের বাচ্চাদের মাটির ওপর হঠাৎ উবু হয়ে বসে পড়তে দেখা যায়। এটা তাদের জন্মগত অভ্যেস। কেননা, এরা জলের ধারে নুড়ির ওপর কিংবা ঝোপঝাড়ের মধ্যে থাকে। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে কিংবা মার সতর্ক করে দেওয়া ডাক শুনলে, বাচ্চারা জমিতে চুপ করে শুয়ে থাকে যতক্ষণ না বিপদ কেটে যায়।

তিতির বা অনেক অন্য জাতের পাখি 'জখম-হওয়া' বা 'খোঁড়া সাজার' অদ্ভুত সুন্দর ভান করে শত্রুর কবল থেকে ছানাদের বাচায়। শত্রুদের নাগালের দু-এক গজের মধ্যে ডানা ঝটপটিয়ে বসে পড়ে 'জখম-হওয়া'র ভাণ করে। শত্রু যখন খুব আশা করে এদের ধরতে আসে, তখন শত্রুকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ উড়ে পালিয়ে যায়।

এত রকম বাঁচবার কৌশল জানা সত্ত্বেও প্রতিবছর কত যে পাখির বাচ্চা মারা যায় তার কোনো হিসেব নেই।

পাখিদের আংটি পরে দেশান্তরে যাওয়া

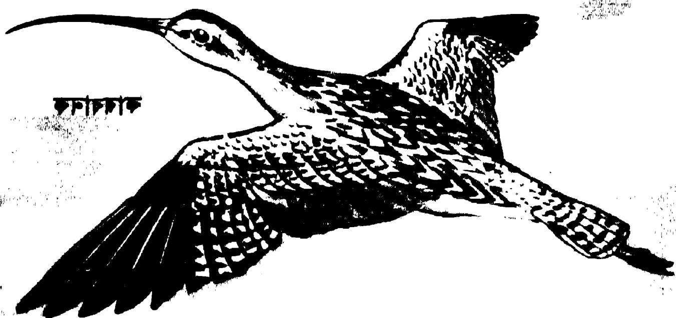
পাখিদের জীবনের একটা বড় রহস্য হল দেশান্তরে যাওয়া। সহজ করে বললে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে চলা। প্রতি বছর শরতে আর শীতের সুরুতে পাখিরা তাদের নিজেদের উত্তর এশিয়ার য়ুরোপের ও আমেরিকার আস্তানা ছেড়ে দক্ষিণ পথে গরম দেশে উড়ে যায়। আবার বসন্তে ও গরমের গোড়ায় নিজের দেশে ফিরে আসে।

আসা-যাওয়ার ব্যাপারে পাখিরা বড় সময়নিষ্ঠ, খারাপ জলহাওয়ার জন্যে যদি না আটকে পড়ে। শীতের আগমনী জানিয়ে কবে পাখিরা ফিরে আসবে তা দিনগুণে বলে দেওয়া যায়।

কোনো কোনো জাতের পাখি কাছে পিঠেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। থাকার বা খাবার অসুবিধের জন্যে মোটামুটি সব পাখিরাই একটু-আধটু জায়গা বদল করে। এই ধরণের জায়গা বদল উত্তর ভারতে বেশি দেখা যায়। কেননা, এখানে ঋতুর আসা-যাওয়া বড় নিয়মমাফিক।

গরমের সময় যেসব পাখি পাহাড়ের চূড়ায় আস্তানা গাড়ে তারা শীতের সময় পাহাড়ের নিচে অথবা সমতলভূমিতে নেমে আসে। এই ধরণের পাখি ভারতেই বেশি দেখা যায়। এখানে বিশাল হিমালয়ের পাশেই গঙ্গার সমতলভূমি।

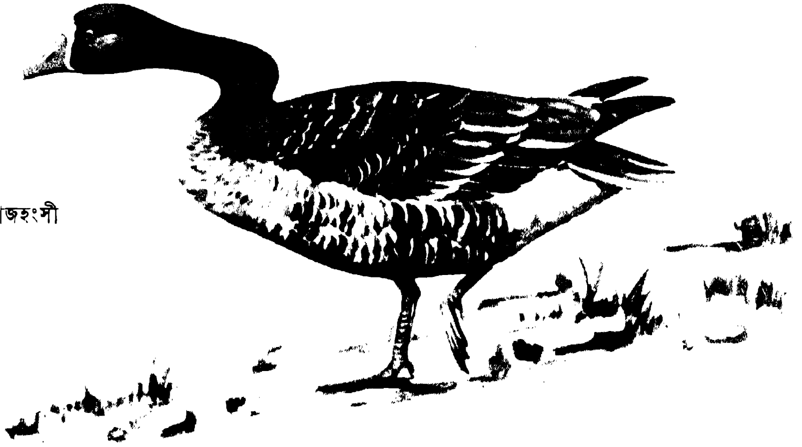
ছোট ছোট সাহসী যাত্রী-পাখিরা পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল আর নদীনালা পেরিয়ে দূরদূরান্তরে যাবার সময় অনেক কষ্ট আর বিপদের মুখে পড়ে। অনেক সময় আচমকা ঝড় উঠে এদের যাত্রাপথ পাল্টে দিয়ে অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়। প্রায়ই ঝড়ের মুখে পড়ে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে যায়। রাতে লোকালয়ের তীব্র আলোও এদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।



যাযাবর পাখিরা খুব জোরে ওড়ে না। এদের চলার গতিবেগ সাধারণতঃ ঘণ্টায় 48 থেকে 64 কিলোমিটার। ক্বচিৎ কখনো ৪0 কিলোমিটারও হয়। ছোট ছোট পাখি ঘণ্টায় 4৪ কিলোমিটারের বেশি খুব কমই উড়ে। বেশির ভাগ ডাঙ্গার পাখিরা ঘণ্টায় 64 থেকে ৪0 কিলোমিটার ওড়ে। হাঁসেরা ঘণ্টায় ৪0 থেকে ৯৬ কিলোমিটার। যাযাবর পাখিরা সাধারণতঃ ৯00 মিটারের নিচ দিয়ে উড়ে যায়, কোনো কোনো পাখি আরও উঁচু দিয়ে চলে।

অনেক পাখি যাবার পথে বিশ্রামের জন্যে থেমে থেমে যায়। অনেকে না-খেয়ে, না-থেমে এক নাগাড়ে অনেক দূর উড়ে চলে। কেউ শুধু দিনে, কেউ-বা দিনরাত সব সময়ই উড়ে চলে। বেশির ভাগ পাখি কিন্তু সূর্য-ডোবার পর রাতের অন্ধকারে বেগে উড়ে চলে।

পাখিরা বেশি সময়ই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। সারস আর রাজ-হাঁসেরা ইংরিজি 'ভি' অক্ষরের আকার নিয়ে আকাশে উড়ে চলে। কি সুন্দরই না দেখায় এদের! সকলেরই নজরে পড়ে। আবাবিল, দুধরাজ, তুলোফুড়কি, তীরের পাখি, জলের পাখি সবাই নিজের নিজের দল বাঁধে। ডানা ঝাপটিয়ে, কিচ্‌ মিচ্‌ শব্দ করতে করতে, অথবা নানান সুরে কলরব করতে করতে এরা আকাশে উড়ে যায়।



রাজহংসী

বেশির ভাগ সময় পুরুষ-পাখিরা একসঙ্গে নিজেদের আস্তানায় উড়ে যায়। অল্প কিছুদিন পরেই মেয়ে পাখিরা পিছু পিছু যায়।

ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরাও যে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, বহুযুগ থেকেই তা জানা আছে। কিন্তু কেন যে এরা যায় আর কোথায়ই-বা যায়, তাই নিয়ে অনেক অদ্ভুত জল্পনাকল্পনা করা হত। শীতকালে পাখিদের না-থাকাটা দেখে লোকে ভাবত যে এরা মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে।

এদের গতিবিধির খোঁজ খবর নেওয়া সুরু হয় পরে। পাখিদের পায়ে আংটি পরিয়ে, এদের চালচলন খুঁটিয়ে দেখে, এদের বিষয় অনেক কিছু জানা গেছে। এদের গতিবিধির আরও খবর নেওয়ার জন্যে নানারকম নকল অবস্থার সৃষ্টি করে, এদের চালচলনে কিরকম কি তফাৎ হয়, তা দেখা হয়েছে।

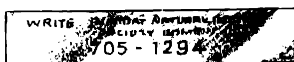
আজকাল, বাচ্চা আর বড় পাখিদের পায়ে আংটি পরিয়ে এদের দেশান্তরে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক কিছু জানা গেছে। পাখিকে ধরে তার পায়ে হাল্কা ধাতুর কিংবা প্লাষ্টিকের আংটি পরিয়ে দেওয়ার

ইংরিজি নামই 'রিঙিং'। আংটির পাতে নম্বর, তারিখ, পাখির পরিচয়-নামা আর পাখিটি দেশান্তরে ধরা পড়লে আংটিটি খুলে কার ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাতে হবে তার পুরো বিবরণ দেওয়া থাকে। আংটি পরিয়েই পাখিটিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। পাখিটিকে যেখানে জ্যান্ত ধরা বা মেরে ফেলা হয় অথবা পাখিটিকে যেখানে মরা-অবস্থায় পাওয়া যায়, সেখান থেকেই পাখির গতি-পথের হদিশ পাওয়া যায়।

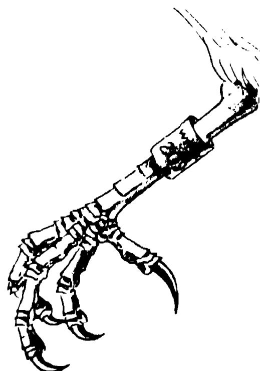
এইভাবে জানা গেছে শরতে পাখিরা উত্তর থেকে দক্ষিণে আর বসন্তে দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়ে যায়। প্রধান চলমান পাখিরা সাইবেরিয়ার আরল সাগর আর বৈকাল হ্রদ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আসে। এমন কি, পশ্চিম জার্মাণী থেকে কিছু হাড়গিলা পাখিও উড়ে আসে।

চীনের তুর্কীস্থান আর মঙ্গোলিয়া থেকে যেসব পাখিরা আসে তারা সাধারণতঃ উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ী প্রবেশ পথ দিয়েই আসে। হিমালয় পর্বতের উত্তর-পশ্চিম দিক হল ভারতে আসার প্রধান প্রবেশ-পথ। কিছু কিছু পাখি সোজাসুজি হিমালয় পর্বত পার হয়ে চলে আসে।



আংটি পরানো



পাখির পায়ে আংটি বেঁধে দিয়ে দেখা গেছে যে তারা অনেক দূর দূর দেশে উড়ে যায়। এমনও দেখা গেছে যে বিলাতী চাহা পাখি শীতের সময় হিমালয় থেকে নীলগিরি পর্যন্ত 2400 কিলোমিটার পথ একনাগাড়ে উড়ে গেছে। মধ্য এশিয়া ও সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে হিমালয়ের ওপর দিয়ে 3200 থেকে 4800 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে জংলী পাতিহাঁস আমাদের দেশের হ্রদে আসে। গোলাপী শালিক পূর্ব ইউরোপ বা মধ্য এশিয়া থেকে আসে। অনেকটা চড়ুই পাখির মতো দেখতে খঞ্জন পাখি হিমালয় ও মধ্য এশিয়া থেকে সমতলভূমিতে আসে। আকারে চড়ুই পাখির অর্ধেক, সবচেয়ে ছোট পাখি তুলোফুড়কি শীতকালে 3200 কিলোমিটার পথ উড়ে আমাদের দেশে আসে।





কোকিল

দেশদেশান্তরে যাবার সময় কত পাখি মারা পড়ে, তবুও কেন এরা দেশান্তরে যায়? এর মূল কারণ: শীতকে এড়িয়ে যাওয়া আর খাদ্যাভাব থেকে রেহাই পাওয়া। জলের পাখিদের বেলায় কারণটা অবশ্য আলাদা। শীতে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে যায়। খাবার জন্যে মাছ বা ঐ জাতীয় কোনোকিছু পাওয়া যায় না। বসন্তকালে এরা গরমকে এড়িয়ে বাসা বাঁধার জন্যে দেশান্তরে যায়।

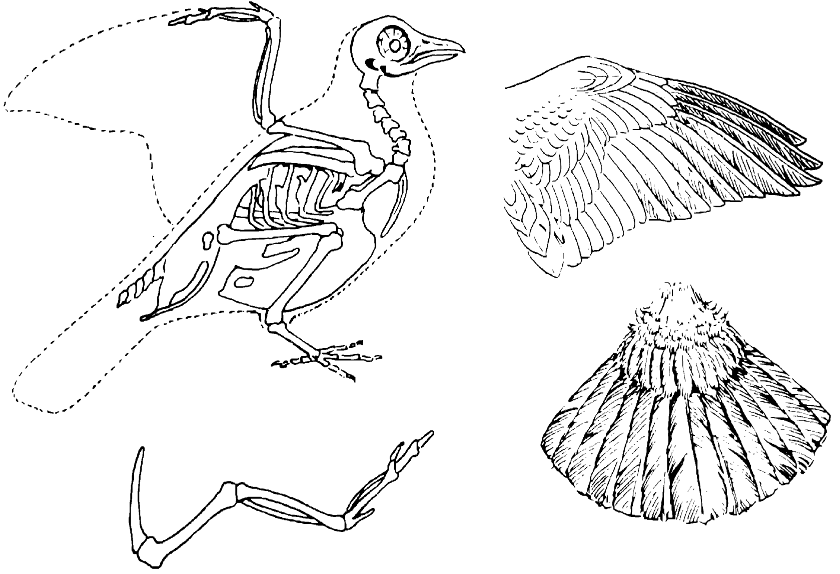
পাখিদের দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা সত্যিই খুব মজার। এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে। পাখিরা কি করে বুঝতে পারে, কখন তাদের যাত্রা সুরু করতে হবে? কোনোকিছু চিহ্ন না-থাকা সত্ত্বেও এরা কি করে সাগর পাড়ি দেয়? বছরের পর বছর এরা কি করে একই জায়গা চিনে ফিরে আসে? কোকিলরা কাকের বাসায় নিজেদের বাচ্চাদের ছেড়ে ভারতে ও আফ্রিকায় ফিরে আসে। এই বাচ্চারা বেশ কয়েক হপ্তা পরে, পথের কোনো পরিচয় না-জেনে, পথ চিনে কি করে মা-বাপের সঙ্গে যোগ দেয়? এইরকম অনেক প্রশ্নেরই জবাব এখনও মেলেনি, যা সত্যই অবাক করে! এসবের উত্তর তোমরাই খুঁজে বার করবে একদিন।

শরীরের গঠন

পাখির শরীরের গঠন ও তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের কথা, ভাবতে গেলে, আরও অবাক লাগে। পাখিরা পালকে ঢাকা ছোট জীব। এদের দেহের কাঠামো অনেকটা আমাদেরই মতো। দুটো ডানা, দুই পা আর একটা ল্যাজ। ডানা দুটো এমনি যে সহজেই ইংরিজি 'জেড্' হরফের আকারে মুড়ে ফেলা যায়, এতে কাঁধ নাড়ানোরও কোনো অসুবিধে হয় না। আসলে, ডানা দুটো ঠিক পুরোপুরি আমাদের হাতের মতো। তফাৎ শুধু হাতের তেলোর সঙ্গে। পাখিদের ডানার শেষটা একটু লম্বা ধরণের, অনেকটা আমাদের হাতের একটা আঙ্গুলের মত। ডানার হাড়-গুলোর ওপর মাংসপেশী আর পালক এমনভাবে সাজানো, যেন ডানাটা ঠিক একটা ধনুকের মতো দেখতে। এক ঝলকে খোলা ডানাটাকে দেখলে, দেখবে ভেতরটা ছাতার মত ঠিক ওপর দিকে বাঁকানো। একটা খোলা ছাতাকে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ করো আর খোলো। দেখবে বন্ধ করার চেয়ে খোলা সহজ। কেন, বলতে পার? যখন ছাতা বন্ধ করা হয় তখন হাওয়াটা ছাতার ভেতর আটকে যায়, তাই বন্ধ করা শক্ত হয়। পাখিদের ওড়ার বেলায় এই নিয়মই খাটে।

পাখির ডানার পালকগুলো থাকে থাকে ভাগ করা। ডানার সামনে আঙ্গুলের মতো লম্বা দিকে দশটা পালকের একটা থাক আছে যা পাখিদের উড়তে সাহায্য করে। এদের 'মুখ্য' পালকগুচ্ছ বলা যেতে পারে। এরই সাহায্যে এরা হাওয়া কাটতে কাটতে উড়ে যায়। এর পরের থাকেই 'গৌণ' পালকগুচ্ছ আছে, যাদের সংখ্যা বারো থেকে চোদ্দ।

উড়তে সাহায্য করে এমন পালক ছাড়াও অনেক পালক পাখির ডানায় সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। এরা পুরো ডানাটাকে বাঁকা আকার দেয় আর ওড়ার 'মুখ্য' ও 'গৌণ' পালকগুচ্ছের ভারও রাখে।



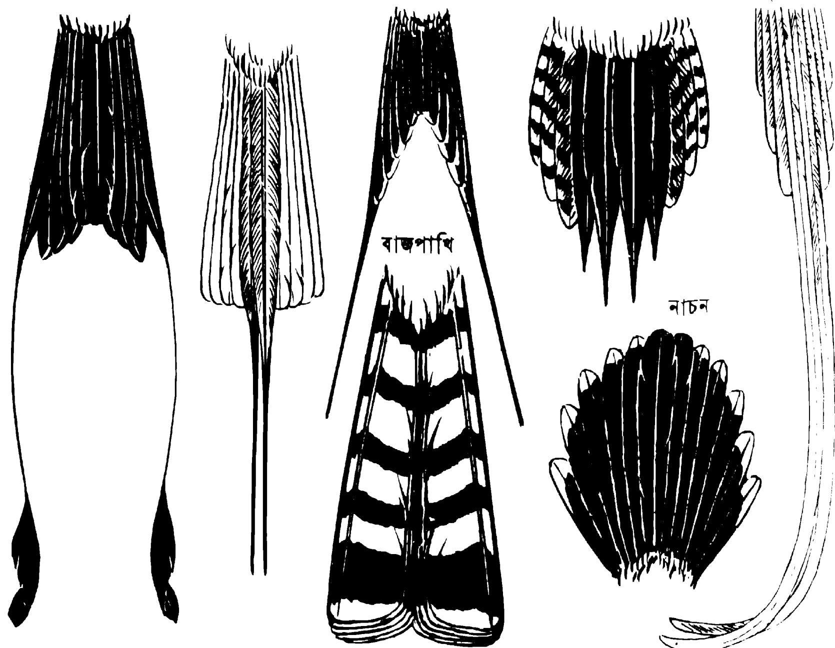
পাখির কঙ্কাল

ডানা আর কাঁধ যেখানে মিলেছে সেখানকার পালকগুলোকে 'স্ক্যাপিউলার' বা ধর্ম-যাজকের শিরস্ত্রাণ বলে। বেশির ভাগ পাখিরই এই পালক-গুলো বড় হয়। এরা ডানাটাকে পাখির গায়ের সঙ্গে জুড়ে থাকতে সাহায্য করে। এছাড়া, পাখিরা যখন ডানা মুড়ে রাখে তখন ডানা ও কাঁধের জোড়ার জায়গাটা এই পালকগুলো ঢেকে রাখে আর পাখিকে জলে ভেজার হাত থেকেও রক্ষা করে।

পাখির পুরো শরীরটা শক্ত, নরম আর ফাঁপা হাড় দিয়ে তৈরি। বুকের হাড় চওড়া, মাঝখানটা উঁচু হয়ে গিয়ে অনেকটা জাহাজের তলার জোড় বা 'কিলে'র মত দেখায়। বুকের হাড়ের এই উঁচু জায়গাটা অনেকগুলো পেশী দিয়ে জোড়া। এর জন্যেই পাখিরা ডানা নাড়তে পারে। এই পেশীগুলোকে 'পেক্‌টোরাল' বা বুকের পেশী বলে। সাধারণতঃ বারোটা কি চোদ্দটা পালক নিয়ে এদের ল্যাজ।

পালকগুলো হাত-পাখার মতো একটার ওপর একটা সাজানো। মাঝখানের পালকটা সবার ওপরে থাকে আর তার তলায় দুধারেই অন্য পালকগুলো একটার নিচে একটা সাজানো। ল্যাজ বন্ধ করলে মাঝের পালকগুলোই চোখে পড়ে। নিচের পালকগুলোর শুধু গোড়ার দিকটা বেরিয়ে থাকে।

পাখিরা ল্যাজটা ছড়াতে পারে, গোটাতে পারে, উঁচু-নিচুও করতে পারে। নৌকোর হালের মতো ল্যাজ দিক-নির্দেশেও সাহায্য করে। চড়ুই ও বাজপাখির ডানায় ও ল্যাজে প্রচুর পালক আছে। বেশি পালক থাকলে এদের ওড়া খুব সহজ হয় আর দেখতেও খুব ভালো লাগে। কাদা-খোঁচা পাখির ল্যাজ ছোট, ডানা বড়, তাই ঝটকা



দিয়ে ওড়ে। হাঁড়িচাঁচা পাখির ল্যাজ বড়, ডানা ছোট আর গোল। এরা খুব ঘন ঘন ডানা ঝাপটে উড়ে চলে।

পাখিরা তিনরকম ভাবে উড়তে পারে : (1) ডানা ঝাপটিয়ে, যা বেশির ভাগ পাখিই করে ; (2) হাওয়ায় ভর করে, পাখিরা প্রথমে ডানার সাহায্যে ওড়ে, পরে ডানা না-চালিয়ে হাওয়ায় ভর করে উড়তে থাকে ; (3) হাওয়ায় ভেসে ভেসে ওপরে ওঠা, এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত! ডানা না-নাড়িয়ে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উড়ে চলে।

যে সব পাখি খোলামেলা জায়গায় উড়ে বেড়ায়, তাদের ডানা লম্বা, সরু আর ছুঁচোলো। এরা খুব জোরে ওড়ে। ওড়ার সময় এদের ডানার ঝাপটায় মধুর সুরেলা আওয়াজ বেরোয়। বনের পাখিদের ডানা ছোট আর গোল, ওড়ার সুরুতে এরা খুব শব্দ করে উড়ে যায়। প্যাঁচারও ডানা ছোট, কিন্তু ওড়ার সময় কোনো শব্দ করে না। এদের পালকের ডাঁটিগুলো ভেলভেটের মতো নরম লোমে ঢাকা থাকে বলেই শব্দটা চাপা পড়ে যায়। এইজন্যে এরা যখন উড়ে আসে, এদের শিকাররা বুঝতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন পাখির নিচে নেমে আসার রীতিও বিভিন্ন ধরণের। কেউ ছড়ানো ল্যাজটা নিচু করে নিয়ে ডানা দিয়ে কাঁধটাকে উঁচু করে। তারপর ডানার আগাটা মাটির দিকে করে নিয়ে মাটিতে নেমে এসে ওটাকে আবার গুটিয়ে নেয়।

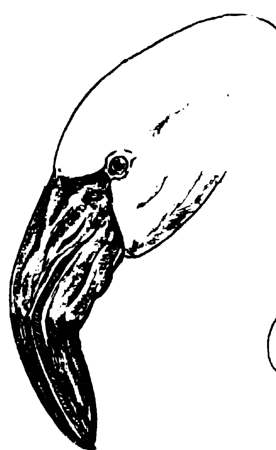
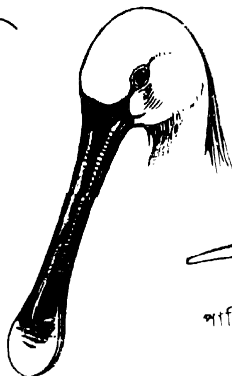
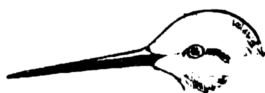
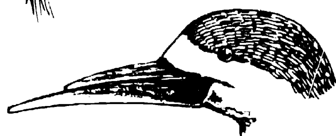
পাখিরা নিজেদের পালক সম্বন্ধে খুবই সচেতন। পালক পরিষ্কার করতে, ঠোঁট দিয়ে পরিপাটি করে গোছাতে আর পালকে তেল লাগাতে এরা অনেক সময় নেয়। তেলের নলী থেকে ঠোঁটে তেল মাখিয়ে নিয়ে এরা পালক পরিষ্কার করে, তেলের এই নলী ল্যাজের নীচে থাকে। অনেক পাখি বছরে একবার করে পালক ফেলে দেয়। একেই

'পালক ঝরানো' বলে। শরতকালে ছোট বড় সব পালকই এরা ফেলে দেয়। নতুন পালক আবার গজায়। কিছু পাখি বছরে দুবারও পালক ফেলে দেয়, শরতে আর বসন্তে। আবার কোনো কোনো পাখি, হয় সমস্ত পালক, নয় তো কিছু কিছু পালক, বছরে তিনবারও ফেলে দেয়।

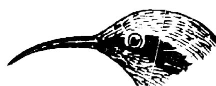
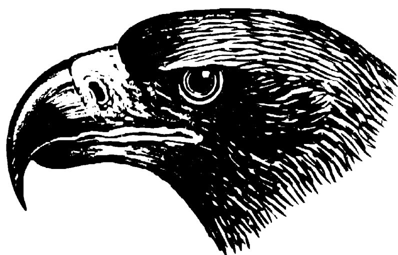
পাখিরা ঠোঁটের সাহায্যে খাবার খুঁজে নেয় ও খায়। চিল, ঈগল, বাজ ও শাহীবাজ পাখির ঠোঁট ছোট, বঁড়শির মত বাঁকা। ফলে, খুব সহজেই এরা শিকার ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে পারে। সাদা কাঁক পাখি লম্বা বর্শার মতো ঠোঁট দিয়ে ন্যালন্যালে মাছ বিঁধতে পারে। সাঁতারু পাখিরা লম্বা ঠোঁট দিয়ে ডোবা থেকে খাবার খুঁজে খায়। চড়ুই পাখিরা চোঙার মত ছোট ঠোঁট দিয়ে ধান ছাড়িয়ে গুঁড়িয়ে খেয়ে ফেলে। হাঁসেদের চ্যাপ্টা চওড়া ঠোঁটের মধ্যে দাঁতের মত সারি সারি ছোট ছোট পাত আছে। এরই সাহায্যে জলের ভেতর থেকে এরা খাবার জিনিস ছেঁকে ধরে খায়।

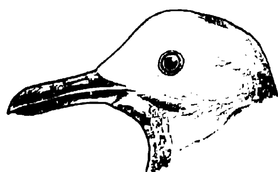
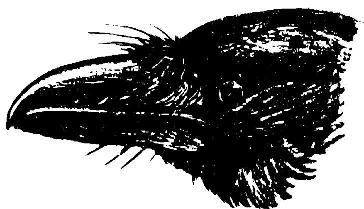
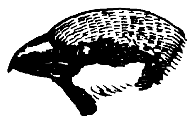
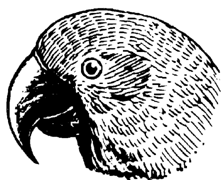
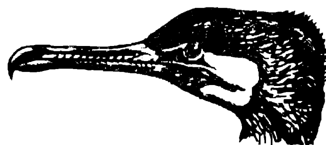
আবাবিল ও বাতাসী পাখির ঠোঁট ছোট হলেও মুখ খুব চওড়া। তাই অনায়াসেই এরা উড়ন্ত পোকামাকড় ধরতে পারে। ছোট মৌটুসী পাখি সরু বাঁকা ঠোঁট দিয়ে ফুলের মধু খেয়ে নেয়।

পাখিদের ঠোঁটই হাতের কাজ করে। ঠোঁট দিয়েই জিনিস ধরে. তোলে ও দেওয়া-নেওয়া করে। বোনা, সেলাই, বাচ্চাদের দেখাশোনা, শিকার ও আত্মরক্ষা—সবই ঠোঁটের সাহায্যে করে। এই ঠোঁট দিয়েই এরা সাঁড়াশী, সন্না, কাঁচি, জাঁতি, আঁকশী, বর্শা ও চালুনীর কাজ চালিয়ে নেয়। অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে পাখিরা খুব সহজে গলা বাঁকাতে পারে বলেই ঠোঁট দিয়ে এতো কাজ করতে পারে। এমন কি এরা গলা গোল করেও ঘুরিয়ে আনতে পারে।

পাখির ঠোঁট বা চঞ্চু

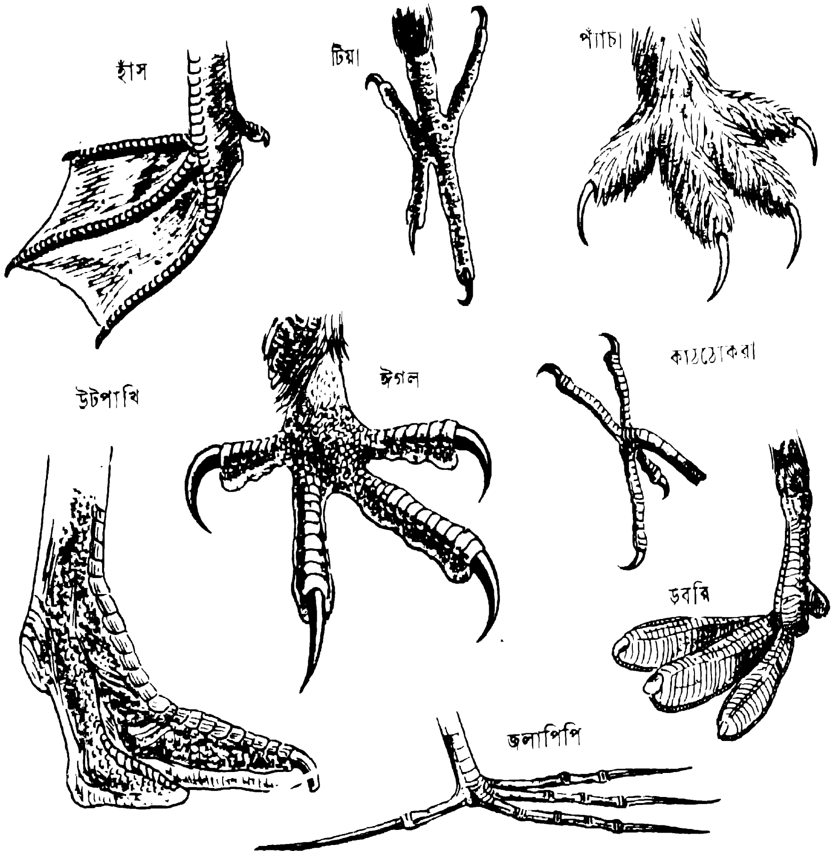







ঠোঁটের মত পা দিয়েও এরা নানান কাজ করে। ছুটোছুটি, দাঁড়ে বসা, চুলকোনো, জলের মধ্যে হাঁটা, আঁকড়ানো, সবই পা দিয়ে করে। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে কিছু পাখি পা দিয়েই শত্রুকে আক্রমণ করে। এদের পায়ের প্রথম আঙ্গুল পেছনের দিকে থাকে। এটাকে এরা হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মতো ব্যবহার করে। দ্বিতীয় আঙ্গুলটা পায়ের ভেতর দিকে, এতে দুটো জোড়। তৃতীয়টা পায়ের মাঝে, তিনটে জোড় থাকে। চতুর্থ আঙ্গুলটা বাইরের দিকে, এতে আবার চারটে জোড়। মোটামুটি সব পাখির পায়ের গঠনই এই রকম।

যেসব পাখি বেশি দাঁড়ে বসে ও মাটিতে লাফিয়ে বেড়ায়, পায়ের প্রথম আঙ্গুলটা তাদের লম্বা হয়। এই দিয়ে এরা ডাল শক্ত করে ধরে। হাঁসের পায়ের সামনের তিনটে আঙ্গুল একটা ঝিল্লী দিয়ে জোড়া, বুড়ো আঙ্গুলটা প্রায় দেখাই যায় না। সাদা কাকের আঙ্গুলগুলোও খুব সরু, আঙ্গুলের মাঝে ফাঁকও অনেক বেশি। ফলে, নরম মাটিতে এদের পা বসে যায় না। ভরত, চর্চরি পাখিদের বুড়ো আঙ্গুল খুব লম্বা, কিছু আঁকড়ে ধরতে সুবিধে হয়। আবাবিল পাখির সামনের আঙ্গুলগুলো একসঙ্গে জোড়া থাকে। কাঠঠোকরার সামনের আঙ্গুলদুটি দুটি করে জোড়া থাকে। উট পাখি সব সময় চরে বেড়ায়। এদের পা খুব বড় কিন্তু আঙ্গুল মাত্র দুটো করে।

ছোট পাখিরা মাত্র দশ-বারো বছর বাঁচে, ঈগলরা কুড়ি, আর কিছু বড় পাখি নব্বই বছর অবধি বাঁচে।

পাখির গায়ের তাপ 104 ডিগ্রী থেকে 110 ডিগ্রী ফারেনহাইট। কিন্তু আমাদের আর জন্তুদের সুস্থ শরীরের তাপমাত্রা সাধারণতঃ 98.4 ডিগ্রী ফারেনহাইট। আমাদের 106 ডিগ্রী তাপমাত্রা মানেই দারুন জ্বর, আর 110 ডিগ্রীতে পৌঁছবার আগেই আমাদের মৃত্যু হয়।



বাক্সের বাসা আর খাবার জায়গা

পাখিদের বিষয় এত জানার পর তোমরা নিশ্চয়ই এদের কাছে পেতে চাইবে, তোমাদের বাগানে, বাড়িতে। কাছ থেকে ভালো করে দেখে যাতে এদের সম্বন্ধে আরও জানতে পার। বাগানে যদি খাবার ছড়িয়ে দাও আর বাসা বাঁধার জন্যে বাক্স রেখে দাও তো দেখবে এরা সেখানেই বাসা বেঁধে ছানাপোনাদের বড় করছে, ঠিক তোমাদেরই চোখের সামনে।

দেখবে কেমন করে এরা বাসা বাঁধে, বাচ্চাদের খাওয়ায়। তবে এদের খুব কাছে যাবে না; আর বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে থাকবে। কাছে গিয়ে বিরক্ত করলে এরা বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে অন্য নিরিবিলি জায়গায় বাসা বাঁধবে। বাচ্চাদের মা-বাবারা যখন খাবার খুঁজতে বেরিয়ে যাবে, তখন এক আধবার উঁকি ঝুঁকি মেরে বাচ্চাদের দেখতে পার। কিন্তু খবরদার! বাচ্চাদের বাসার ভেতর থেকে টেনে বার করার চেষ্টা কর না। বাচ্চারা ভীষণ ক্ষীণজীবী, সহজেই চোট লেগে যেতে পারে।

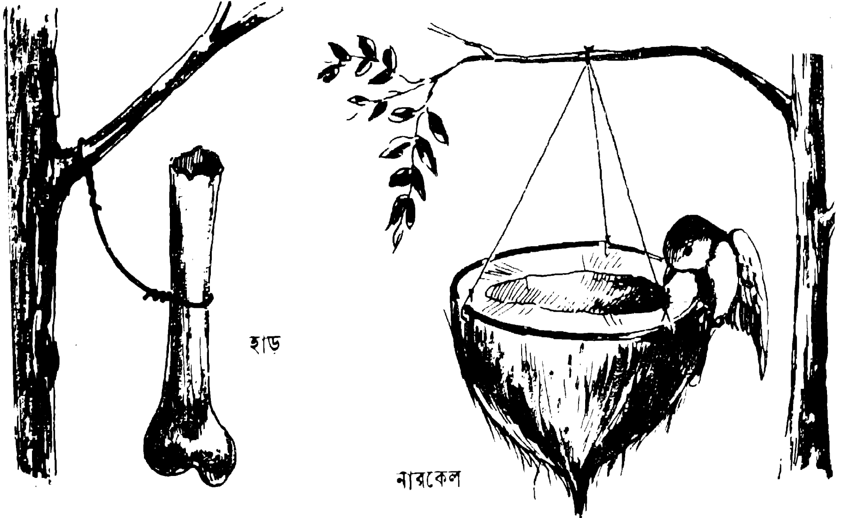
বাগানের একটা ভালো জায়গায় কিছু জোয়ার বা অন্য কোনো শস্যের কণা ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে এক কোণে লুকিয়ে থেকো। দেখবে, ছোট চড়ুই পাখিরা লাফাতে লাফাতে এসে জড়ো হবে। খাবারের দিকে এগিয়ে যাবার সময় দুধারে ঘাড় বেঁকিয়ে আগে দেখে নেবে, কোথাও কোনো শত্রু লুকিয়ে আছে কিনা। অনেক সময় না-খেয়েও উড়ে যেতে পারে। কিন্তু ধৈর্য হারিয়ো না। অপেক্ষা কর। দেখবে, চড়ুই তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ফিরে এসে ধান খেতে সুরু করে দিয়েছে।

একটা নারকেলকে দুভাগ কর, দুটো মালাকেই ছ্যাদা করে

শক্ত সূতো দিয়ে উল্টো করে গাছে কিংবা জানলায় যদি বেঁধে দাও তো দেখবে, পাখিরা নারকেল খেতে এসে গেছে। নারকেল এদের বড় প্রিয় খাদ্য। বিশেষ করে, রামগাঙরা নারকেল দেখলেই ছুটে আসবে।

মাংসের দোকান থেকে একটা বড় ফাঁপা হাড় এনে সেটাকে ভালো-ভাবে পরিষ্কার করে তার ভেতর চর্বি কিংবা চট্কানো আলু দিয়ে ভরতি কর। এটাকে এইবার বাগানের কোনো গাছের ডালে ঝুলিয়ে দাও, দেখবে পাখিরা দলে দলে এসে জুটবে।

পাখিদের খাবার টেবিলও দুরকমে তৈরি করতে পার। এক মিটার উঁচু বাঁশে একটা তক্তা এমনভাবে বাঁধ যাতে বেড়াল না উঠতে পারে। এটাতে কিছু খাবার দিয়ে গাছের ছায়ায় রেখে দিতে পার। নয় তো একটা তক্তাকে চারকোণে ছেঁদা করে দড়ি দিয়ে



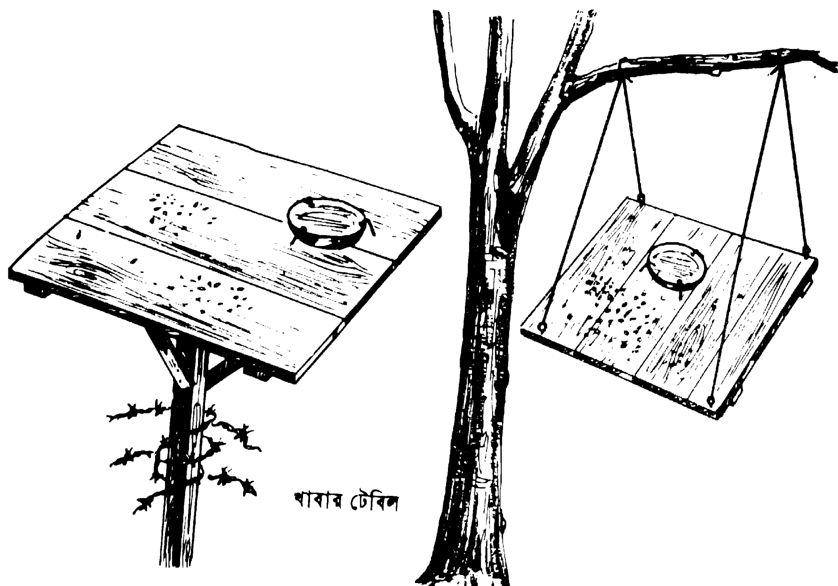
গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে পার। এই খাবার টেবিলে জল রাখতে ভুলো না যেন। জল যাতে রাখবে, সেটা যেন টেবিলের সঙ্গে আঁটকে থাকে, জল গড়িয়ে যেন পড়ে না যায়। পাখিরা খুব ঘন ঘন জল খায়, বিশেষ করে গরমকালে। এই সময় স্নান করতেও ভালোবাসে।

বাগানে কোনো বুড়ো কিংবা শুকনো গাছ থাকলে দেখবে তার গর্তে কিংবা ফোকরে অনেক পাখি বাসা বেঁধে আছে। এইসব জায়গায় বাসা বেঁধে থাকতে এরা খুব ভালোবাসে। যদি মনে হয়, এই বুড়ো কিংবা শুকনো গাছ তোমার বাগানের শোভা নষ্ট করে দিচ্ছে, তাহলে, তার কাছে-পিটে কোনো লতানো ফুলগাছ বা বুগেনভেলিয়া লতা পুঁতে দাও। বুড়ো গাছটিকে ঢেকে দিয়ে এরা বাগানের শোভা বাড়াবে। পাখিরাও তোমার কাছে থাকবে।

এইভাবে পাখিদের জন্যে বাক্সের বাসাও তৈরি করতে পার। কিন্তু তার আগে তোমাদের কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। পাখিরা কি রকম জায়গায় বাসা বাঁধতে ভালোবাসে, কি রকমের বাসা বাঁধে আর কি কি জিনিস দিয়ে বাসা তৈরি করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের পাখির রুচি ও প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের। যে সব পাখি আমাদের আশেপাশে থাকে তাদের সুবিধে মতো যদি বাক্সের বাসা তৈরি করতে না পার তবে সব চেষ্টাই মাটি হয়ে যাবে। পাখিরা যেসব বাসা গাছের ডালে বা গুঁড়ির কোটরে করে, সেগুলো যদি লক্ষ্য কর তো দেখবে বাসাগুলো নানান আকারের ও মাপের।

পাখিদের জন্যে বাক্সের বাসা তৈরি করার ও রাখার জায়গা ঠিক করার কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন,—

(1) ভিতরে ঢোকার মুখটি বাক্সের তলা থেকে বেশ কয়েক ইঞ্চি উঁচুতে হওয়া চাই।



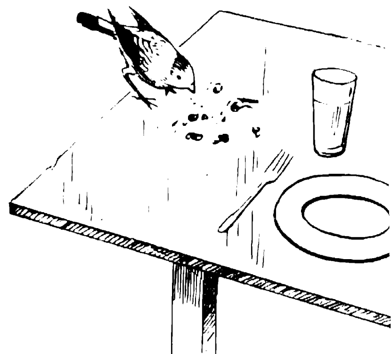
(2) বাসাগুলো দশ থেকে তিরিশ ফিট লম্বা বাঁশের মাথায় বেঁধে দিতে হবে। কিংবা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, ঐ গাছের ডাল দিয়ে বাসা যেন ঢাকা না-পড়ে।

(3) পাখিদের বাচ্চা বড় হয়ে উড়ে যাবার পর সব বাক্সগুলো নামিয়ে পরিষ্কার করে পরের বারের জন্যে তুলে রাখা চাই।

এই বাক্সের বাসা বেশি দামী না-হলেও চলবে। প্লাইউড্, ডিল উড্, সাবানের খালি বাক্স কিংবা প্যাকিং কেস দিয়ে নিজেরাই সব বাক্স তৈরি করতে পার।

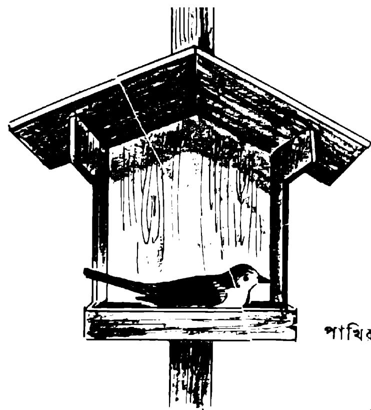
বাক্সের বাসার সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা জানা দরকার। প্রথম কথা হল এতে যেন জল না ঢোকে, অথচ আলো বাতাস প্রচুর থাকা চাই। বাক্সগুলো হাল্কা সবুজ, কটা বা ধূসর রঙের করবে।

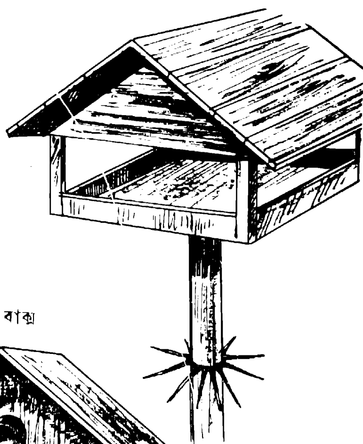




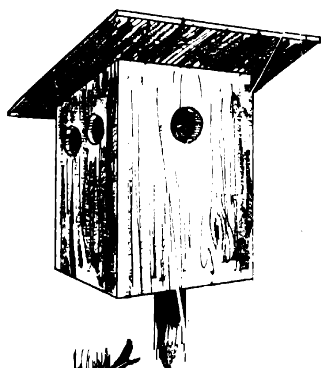
বাক্সের বাসা নানান আকারের হতে পারে। বাক্সের মাপ পাখির মাপসই হওয়া চাই। শালিক পাখির বাসার মাপ 15 সেঃ মিঃ × 15 সেঃ মিঃ, আর উচ্চতা 45 সেঃ মিঃ-র হওয়া চাই। ঢোকবার জায়গা তলা থেকে 15 সেঃ মিঃ উঁচুতে আর ফুটোটার ব্যাস অন্ততঃ 5 সেঃ মিঃ রাখা ভালো।

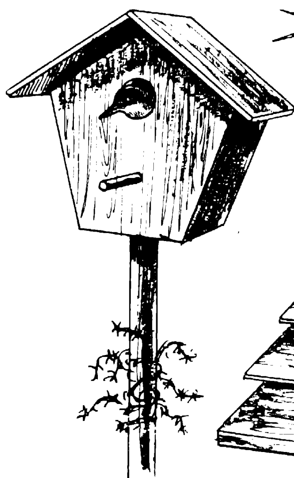
চড়ুইয়ের জন্যে বাক্সের উচ্চতা 15 সেঃ মিঃ হলে ভালো হয়। চারিধারে খোলা রাখবে। প্যাচার বাক্সের তলা 25 সেঃ মিঃ × 45 সেঃ মিঃ, উচ্চতা 45 সেঃ মিঃ, ঢোকার ফুটো তলা থেকে 10 সেঃ মিঃ উঁচুতে, মুখটা 20 সেঃ মিঃ ব্যাসের হওয়া চাই। কাঠঠোকরার জন্যে

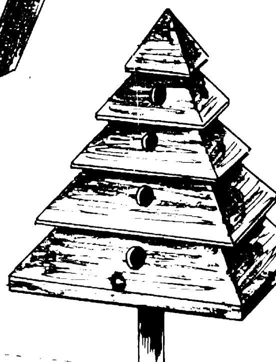


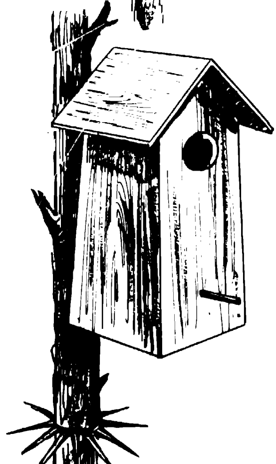


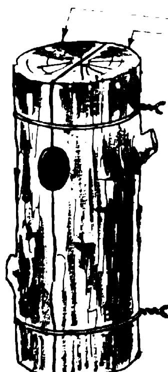
পাখির বাসার বাক্স

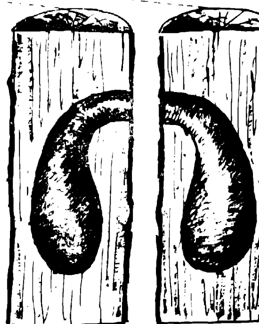












বাক্সের উচ্চতা 38 সেঃ মিঃ রাখা দরকার, ঢোকবার জায়গা 5 সেঃ মিঃ ব্যাসের, আর তলা থেকে 30 সেঃ মিঃ উঁচুতে রাখা ভালো।

এই বাক্সের বাসাগুলো বাগানের এমন জায়গায় রাখবে যেখানে সারাদিন রোদ না পায়, অথচ সকাল-বিকেল যেন রোদ ঢোকে।

পাখিদের জন্যে এই রকম বাক্সের বাসা আর খাবার জুগিয়ে দিলে দেখবে অনেক রকম পাখি, এমন কি খুব লাজুক প্রকৃতির পাখিরাও কাছে আসবে। এইভাবে বাগানে একটা পাখিদের আস্তানা বা পাখিদের আশ্রয় স্থান গড়ে তুলতে পার, যেখানে এরা বেশ নির্ভয়ে থাকতে পারবে। ক্ষিদে-তেষ্টা আর শিকারীদের হাত থেকেও বাঁচতে পারবে। আর এই বাঁচায় ভেবে দেখ, তোমরাই তাদের কতটা সাহায্য করতে পার।



চোর-পাখি

পাখি-দেখার নিয়ম

পাখি চেনার জন্যে প্রথম দরকার সতর্ক চোখ আর কান, একটা নোটবই আর পেন্সিল, একটা পাখির ছবিওয়ালা বই। সাবধানে চুপচাপ পাখি দেখার অভ্যেসও খানিকটা আয়ত্ত করা দরকার। নতুন যারা পাখি দেখা শিখছে তাদের খানিকটা শেয়ালের চালচলনও নকল করতে হয়। আমরা তো পাখির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারি না, অথচ শেয়াল এদেরই ধরে খায়। জন্তুদের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয় জান? 'আত্মরক্ষাকারী বর্ণবৈচিত্র্য' তাদের সাহায্য করে। এছাড়া, শেয়ালদের পায়ের থাবা নরম গদির মতো, সেজন্য তারা নিঃশব্দে

চলাফেরা করতে পারে। এরা চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। এদের এইসব ধরন-ধারণ সহজেই আমরা নকল করতে পারি।

সবচেয়ে আগে দরকার পাখিদের চোখ এড়ানোর জন্যে কালো, সাদা বা খুব বেশি জমকালো রঙের কাপড় না-পরা। শুকনো পাতার কিংবা নিষ্প্রভ সবুজ রঙের কাপড় পরা ভালো। বেগুনী রঙেরও পরতে পার, কেননা, ঐ রঙটা পাখিরা দেখতে পায় না। যাতে শব্দ না-হয় তার জন্যে রবারের শুকতলা দেওয়া জুতো পরবে। ঝরা পাতা কিংবা ডালপালার ওপর দিয়ে হাঁটবে না, আওয়াজ হবে, পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে যাবে।

তারপর গাছের আড়ালে, ঝোপেঝাড়ে অথবা ঘাসের মধ্যে পছন্দসই এমন জায়গা বেছে নেবে যাতে চট করে তোমাকে ওরা দেখতে না পায়। এবার চুপটি করে বসে থাকতে হবে। হাত-পা বা মাথা বেশি নাড়াবে না। চুপটি করে বসে থাকলে পাখিরা তোমার খুবই কাছে আসবে, তুমি এদের খুব ভালো করে দেখতে পাবে। দরকার হলে তোমাকে সাপের মত বুকে হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে। খোলা জায়গায় পাখিদের কাছে যাবার জন্যে সোজা পথে না গিয়ে এঁকে-বেঁকে, ঘুরে ঘুরে, আড়ভাবে এগোলে ওদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে। তোমরা যারা পাখি দেখতে চাও, শেয়ালের কাছ থেকে আরও একটা জিনিস শিখতে পার। শেয়াল একলা শিকার করে। একলা হলে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, এতে পাখি দেখায় কোনো ব্যাঘাতও হবে না। পাখি দেখার সময় ঐ দিকেই পুরো মনোযোগ দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেকক্ষণ ধরে পাখি দেখতে হলে যথেষ্ট-শারীরিক সংযম ও মানসিক স্থৈর্যের দরকার। তাই বলে সব সময় চুপচাপ বসে থাকলেই পাখি দেখা যায় না। এদের খোঁজে তোমাকে সাইকেলে

বা গাড়িতে চড়তে হতে পারে, এরোপ্লেনে কিংবা নৌকোয় দাঁড় বেয়েও যেতে হতে পারে। বেশ কিছুটা হাঁটতেও হতে পারে। গাছের মাথায় কিংবা পাহাড়ের ওপর উঠে যদি পাখি দেখতে হয়, তাহলে খুব সাবধান, এরা তোমায় আঁচড়ে কিংবা ঠুকরে দিতে পারে। শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম—তোমাকে রাতের পর রাত জেগে কাটাতেও হতে পারে। তাই 'পাখি-দেখা'কে যেমন চড়ুই-ভাতির মতো সখের ব্যাপার হিসেবে নিতে পার, আবার তেমনি ভালোভাবে অবসর সময় কাটানোর নেশা হিসেবেও নিতে পার। অথবা রীতিমত বৈজ্ঞানিক-ধাঁচেও পাখি-খোঁজার চর্চা করতে পার।

পাখি-চেনার কাজে বসন্ত কিংবা গরমকালের প্রথম দিকটাই ভালো। এই সময় এদের সহজেই চিনতে পারা যায়। শীতের সময় যেসব পাখি স্থানান্তরে আসে তাদের সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলার ভয় থাকে না। জুলাই মাসই সবচেয়ে ভালো, এই সময় অনেক পাখির বাচ্চাও দেখা যায়।

ভোরবেলা আর সন্ধ্যের সময় পাখি সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। বেশির ভাগ পাখিই এই সময় বেশ কর্মতৎপর অথবা গান গাইতে ব্যস্ত থাকে। ঝড়-জলের দিন পাখি দেখার সুবিধে হয় না। ঝড়ের সময় ডানা একটু মেললেই হাওয়ার বেগ এদের অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই ঐ সময় এরা চুপচাপ বাসায় থাকে। মুষলধারে যখন বৃষ্টি হয় তখনও এরা বাসাতেই থাকে। তবে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে এরা বেশ মজা পায়, এদিক-ওদিক উড়ে বেড়ায়।

জলের পাখিদের কিন্তু খুব দূর থেকে দেখতে হয়। যদি চুপিচুপি খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে পার তো কিছুটা কাছ থেকেও দেখতে পারবে। পাখি দেখার অর্ধেক মজাই এদের আড়ি পেতে দেখায়, অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি দিয়ে এদের চালাকি ফাঁস করে দিয়ে এদের দেখে নেওয়ার মধ্যে। পাড়ে দাঁড়িয়ে ছোট 'চিক' বা পর্দাজাতীয় জিনিসের আড়ালে থেকে জলের পাখি খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়।

পাখি-দেখায় ওস্তাদ যারা, তারা পাখি দেখার আগে, পাখির ডাক শোনে। তোমরাও পাখির ডাক শুনবে, ডাকটা কোনখান থেকে আসছে তা বুঝে এগিয়ে যাবে। অনেক পাখি কাছ থেকে ডাকলেও, মনে হবে আওয়াজটা দূর থেকে আসছে। তেমনি আবার দূর থেকে ডাকছে এমন পাখির আওয়াজও মনে হবে খুবই কাছের। পাখিরা পাতার আড়ালে থেকে যখন ডাকে, ডাক শুনে কখনও মনে হবে সামনের দিক থেকে আসছে; কখনও বা মনে হবে দূরের গাছ থেকে আসছে। অনেকে আবার এত আস্তে ডাকে যে ভুল হয় অনেক দূর থেকে ডাকছে বলে।

পাখি দেখার সময় এই কটা কথা নোট বইতে টুকে রাখবে। তারিখ, সময়, আবহাওয়ার অবস্থা, জায়গার নাম আর জায়গাটা কি ধরণের। পাখির মাপও লিখতে হবে। প্রথম প্রথম মাপ লিখতে অসুবিধে হবে। চেনাজানা পাখির সঙ্গে তুলনা করে মাপ লিখতে পার। নামকরা কিছু পাখির নাম নোট বইয়ের প্রথম পাতায় লিখে রাখবে। চড়ুই, বুলবুল, ময়না, কাক, চিল। যে পাখিটা তুমি দেখছ, সেটার মাপ যদি এই পাঁচরকম পাখির মাপের সমান না-হয়, তাহলে যে পাখির মাপের সবচেয়ে কাছাকাছি, সে পাখির নামের সঙ্গে যোগ (+) কিংবা বিয়োগ (−) চিহ্ন দিয়ে মাপ লিখে রাখবে। যদি কোনো পাখি চড়ুই পাখির চেয়ে একটু বড় হয় তাহলে লিখবে চড়ুই (+), যদি ময়না পাখির চেয়ে সামান্য একটু ছোট হয় তবে ময়না (−)। এইভাবে পাখির মাপ লিখতে লিখতে তোমরা পাখির বিভিন্ন মাপ সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে পড়বে।

এইবার দেখতে হবে পাখির আকার অর্থাৎ রোগা না মোটা। পাখিরা গায়ের পালক খুসিমতো ফোলাতে পারে, তাই রোগা কিংবা মোটার ব্যাপারে খানিকটা ছাড় অর্থাৎ মারজিন দিতে হবে।

পাখির ঠোঁট কি রকমের তাও লিখতে হবে। লম্বা, সোজা, বাঁকা, সরু না মোটা। চ্যাপটা না আঁকশীর মত, ছোট না চোঙার মত। ঠোঁটটা ভালো করে দেখলেই এর জাত ঠিক করে ফেলতে পারবে। চোঙার মত ঠোঁট এমন ছোট পাখিকে চড়ুই বলে ধরে নিতে পার। তেমনি চড়ুই পাখির চেয়ে ছোট, সামান্য বাঁকা ছোট ঠোঁট হলে তুলোফুড়কি কিংবা পোকামাকড়-খেকো পাখি বলে ধরতে পার। ঠোঁটের রঙটাও সঙ্গে সঙ্গে টুকে নেবে।

এবার পায়ের আকার আর তার মাপ। মন দিয়ে দেখে নাও ঠ্যাং-টা লম্বা না বেঁটে। যদি পা লম্বা হয়, তাহলে বুঝবে জলচর পাখি। আর যদি পা ঝিল্লি দিয়ে জোড়া হয়, তাহলে হাঁস-জাতের পাখি বলে ধরবে। পায়ের রঙটাও লক্ষ্য করবে।

ল্যাজের দৈর্ঘ্য এবং আকৃতিও জানতে হবে। ল্যাজটা কি ধরণের : ছোট, খোঁচাখোঁচা না খাঁজ কাটা। ল্যাজের মাথাটা চৌকোপানা, গোল, না ছুঁচোলো। ল্যাজটা ওপর দিকে খাড়া, না নিচের দিকে নামানো। ল্যাজটা নড়ে কি ? যদি কোনো পাখি দেখতে পাও যার গায়ে তামাটে রঙের নানান ছাপ, ঠোঁটটা আঁকশীর মতো, আর ল্যাজটা খোঁচা খোঁচা তাহলে একে চিল বলে ধরে নিতে পার। তেমনি যে পাখির ঠোঁট খুব লম্বা, সোজা, ছুঁচোলো; ঠোঁটের রঙ কটা হলদে, ল্যাজ ছোট, ঠ্যাং লম্বা, পালক সাদা ; সে পাখিকে সাদা কাক বলে জানবে।

পাখির মাথার ঝুঁটি, তার গঠন আর রঙও দেখতে হবে।

গায়ের রঙও লক্ষ্য করতে হবে। সাধারণতঃ এইটাই আমরা বেশি নজর করি। গায়ের রঙ খুব জমকালো না ফিকে, কোন রঙের আধিক্য। মাথা, পিঠ, পিঠের ডানা ও ল্যাজের ওপর দিকটার রঙও খেয়াল করবে। এরপরে গলা, বুক, পেট ও ল্যাজের তলার দিকের রঙ। বুকের

আর তলপেটের রঙ সাধারণতঃ একটু গাঢ় দেখায়, কেন না, পুরো আলোতে দেখা যায় না। সাদা ধপধপে রঙটা মনে হয় ছাই রঙ।

কোন জায়গার কোন রঙ, সেটা কিন্তু ভুললে চলবে না। মনে করে রাখার মতো কোনো চিহ্ন নজরে পড়লে তাও লিখে রাখতে হবে। এই ধরণের চিহ্ন বুকের দিকেই খুঁজবে। এরপর খেয়াল করবে, পাখিটা এক রঙা না নানা রঙের, সোজা দাগ কাটা না আড়ভাবের ডোরাকাটা। ল্যাজের মাথাটাও কি ডোরাকাটা? সাদা সাদা ছোপ না শুধু সাদা দাগ? পাছাতেও কি ছাপ আছে? ডানাগুলো কি হাল্কা চিহ্ন আঁকা না সাদামাটা? তুলোফুড়কি আর নাচন জাতের ছোট পাখিদের চেনার জন্যে তাদের পালকে এই চিহ্ন আঁকা আছে কি নেই তা লক্ষ্য করবে। চোখের চারিদিকে গোল দাগ, না চোখের ওপরে শুধু একটা লম্বা দাঁড়ি? মাথায় ঝুঁটিটা ছাপওয়ালা না দাগকাটা?

জলের পাখিদের ডানাও খুব ভালো করে দেখতে হবে। ডানার মাথা কালো না হাল্কা ছোপকাটা; এক রঙা না ডোরা-কাটা। পাখির মাপের সঙ্গে এই ধরণের একটা চিহ্ন মেলাতে পারলেই পাখির পরিচয় জানা সহজ হয়ে যায়। আর যদি পাখিটাকে এঁকে নিতে পার তো কথাই নেই। পাখির দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের বৈশিষ্ট্য আঁকা ছবিতেই পেয়ে যাবে। পালক, ঠ্যাং, ঠোঁট আর চোখের পুরোপুরি বর্ণনাও সেখানে পেয়ে যাবে।

পাখির ডাকই অনেক সময় পাখির একমাত্র পরিচয়। তাই পাখির ডাকও খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। কারো গলা সুরেলা, কারুর কর্কশ, কেউবা আবার গলা কাঁপিয়ে গান করে। কোকিল আর ছিপক পাখিকে

ডাক শুনেই চেনা যায়। অচেনা পাখির ডাকটা কথায় লিখে নিতে চেষ্টা করবে। যেমন, 'চিউহুইট,' 'টী-টী-কা-কা,' 'চিয়ার-ইউ-চিয়ার-ইউ,' 'টী-টী,' 'ফিক্-ফিক্-ফিকার,' 'ওয়েট-মাই-লিপ্‌স্,' 'বো-বো-লিঙ্ক'। এই ধরণের নানান রকমের ডাক শুনতে পাবে। আওয়াজ কি ধরণের লিখে নেবে। সুরেলা না খ্যানখ্যানে; নরম না কর্কশ, কিংবা কাঁপা আওয়াজ কিনা।

শেষে দেখতে হবে কি খায় আর কি রকম করে খায়। কি রকম জায়গায় এদের দেখেছিলে তাও লিখে রাখবে। ডোবায় না নদীর ধারে, বাগানে না ক্ষেত-খামারে, ঝোপেঝাড়ে না জঙ্গলে।

এবার দেখ, পাখিরা গাছে কেমন করে বসে, আড়াআড়ি না সরাসরি। কোনো খোলা দাঁড়ে বসে থাকলে, লক্ষ কর, হুট্ করে উড়ে পোকামাকড় ধরে আবার ঠিক সেই দাঁড়ে ফিরে আসে কিনা। গাছে লতার মতো পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে, না কাঠঠোকরার মত ল্যাজে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। চোরপাখির মতো কি মাথা নিচের দিকে করে নামে?

মাটিতে কি রকমভাবে চলে? ছোটে, হাঁটে না চড়ুই পাখির মতো লাফায়। ঝরা পাতার মধ্যে দিয়ে কি খুরখুর করে ঘুরে বেড়ায়? একা, জোড়ে না দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়? আস্তে না তাড়াতাড়ি ওড়ে? ডানা ঝাপটা জোরে দেয়, না আস্তে? আকাশে চক্কর মারে, না ভাসে? আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে, না আকাশে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাখা নেড়ে চলে?

আকাশে ওপর-নিচে করতে করতে উড়ে যায়, না ঘুঘু-পাখির মতো সোজা তীরের মতো ছুটে যায়। না, এলোমেলো ভাবে উড়ে চলে। আবাবিল পাখির মতো কি বাতাসে ভেসে ভেসে যায়, না বাজপাখির মতো অনেক উঁচুতে উঠে যায়। হাঁসের মতো কি তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটায়, না সাদা কাকের মতো আস্তে-আস্তে ডানা নাড়ে। সমানে ডানা ঝাপটে ওড়ে, না একবার ডানা ঝাপটে অনেকটা উড়ে যায়।

এক জায়গাতেই উড়তে উড়তে হঠাৎ মাথা নিচের দিকে করে কি জলে ডুব দেয় মাছরাঙা পাখির মতো, না, জলে হেঁটে বেড়ায়। লম্বা ঠ্যাংওয়ালা পাখি কি? বেশির ভাগ সময় সাদা কাকের মত চুপচাপ জলে দাঁড়িয়ে থাকে, না কাদা-খোঁচার মতো কাদায় ছুটে বেড়ায়? কাদার মধ্যে ঠোঁট দিয়ে কিছু খোঁজে, না খুঁটে খেয়ে নেয়।

যখন ভালো করে পাখি চিনতে শিখে যাবে তখন এদের বাসা আর ডিম সম্বন্ধে জানবে। পাখির ডিমে 'তা' দেওয়া, ডিম ফোটানো আর ছানাপোনার পালক গজানো বেশ মজার ব্যাপার। পাখি চেনার ক্ষমতা যত বাড়বে, ততই মজার মজার জিনিস জানতে পারবে। তোমার এলাকায় পাখিরা কোথায় থাকে, কত পাখি থাকে, কত পাখি তোমাদের বাড়িতে কিংবা আশেপাশে বাসা বেঁধেছে, কোন কোন ঋতুতে, আর কি রকম জায়গায় এরা চরে, এবং কি কি খায়। এদের রোজকার অভ্যেস, খেলাধূলো, বিয়ে-থা সবই পাখি যারা দেখে তাদের আনন্দের ও দক্ষতা অর্জনের খোরাক জোগায়।

পরিভাষা

আবাবিল	Swallow
ঈগল	Eagle
উট পাখি	Ostrich
কসাই পাখি	Shrike
কস্তুরা	Thrush
কাক	Crow
কাঠঠোকরা	Woodpecker
কাদা-খোঁচা	Sandpiper, Snipe
কারবানক	Curlew, Stone Curlew
কায়েম	Moorhens
কুকা (বা মাহোকা)	Pheasants
কুরিগাংচিল	Tern
কোকিল	Cuckoo, Koel
খঞ্জন	Wagtail
গাংচিল	Gulls
গো-শালিক	Pied Myna
গোলাপী শালিক	Rosy Paster
ঘুঘু	Dove
চড়ুই	Sparrow
চর্চরি	Pipit
চিত্রদোয়েল	Magpie Robin
চিল	Kite
চোর পাখি	Nuthatch
জলপিপি	Jacana
টিট্টিভ বা টিটি পাখি	Lapwing
টিয়া	Parakeet
টুনটুনি	Tailor Bird
ডাহুক	Waterhen, Waterfowl

ডুবুরি	Grebe.
তিতির	Partridge
তুলোফুড়কি	Warbler
দোয়েল	Chat
দুধরাজ	Paradise Flycatcher
ধনেশ	Hornbill
নাচন	Flycatcher, Fantail Flycatcher
নীলকণ্ঠ	Indian Roller
পানকৌড়ি	Cormorant
পাহাড়ী শালিক	Hill Myna
পায়রা	Pigeon
প্যাঁচা	Owl
ফিঙে	Drongo
বক	Stork
বটের	Quail
বসন্ত বৌরী	Barbet
বাজ	Hawk
বাটান	Plover
বাতাসী	Swift
বাবুই পাখি	Weaver Bird
বাঁশপাতি	Bee—eater
বিলাতী চাহা	Woodcock
বুলবুল	Bulbul
বেনে বৌ	Orioles
ভরত পাখি	Lark
ময়ূর	Peacock
মাছরাঙা	Kingfisher
মুরগী	Chicken
মৌটুসী	Sunbird
রামগাঙ্গরা	Tit
লাল বুলবুলি	Minivets

শকুন	Vulture
শালিক	Myna
শাহীবাজ	Falcon
সাদা কাক	Heron
সারস	Crane
হরিয়া	Chloropsis
হাঁস	Duck
হাঁড়ি চাঁচা	Treepie

নমুনা

কী করে নোট বুক রাখতে হয়

কতগুলো দেখা গেল	—
সাধারণ নাম	—চিল
আকার	—পোষা মোরগের মত
রং	—ছোপ ছোপ খয়েরী
চরিত্র	—চোর, ভীতু এবং অলস
আহার	— মূলতঃ মাংস
বাসা	—অমসৃণ খড়কুটো, কখনো বা নোংরা কাপড় চোপড় দিয়ে তৈরী এবড়ো-খেবড়ো মঞ্চের মতো
বাচ্চা দেবার সময়	—জানুয়ারি-এপ্রিল
ডিম	—সাদার ছোপ লাগানো লাল বা খয়েরী
শত্রু	—কাক ও দাঁড়কাক
এবছর যেদিন প্রথম দেখা গেল এবছর শেষ যেদিন দেখা গেছে }	—সারা বছরই দেখা যায়
অন্যান্য বিষয়	—শুধুমাত্র বড় শিকারী চিলের ন্যাজের শেষাংশ ভাগ করা, থাবা দিয়ে খাবার তোলে, ঠোঁট দিয়ে নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অনেক উঁচু থেকে ছোট জিনিসের জন্যও ছোঁ মারে।

ছবি

Printed at Ashoka Offset Works, Delhi.